# রূপান্তর

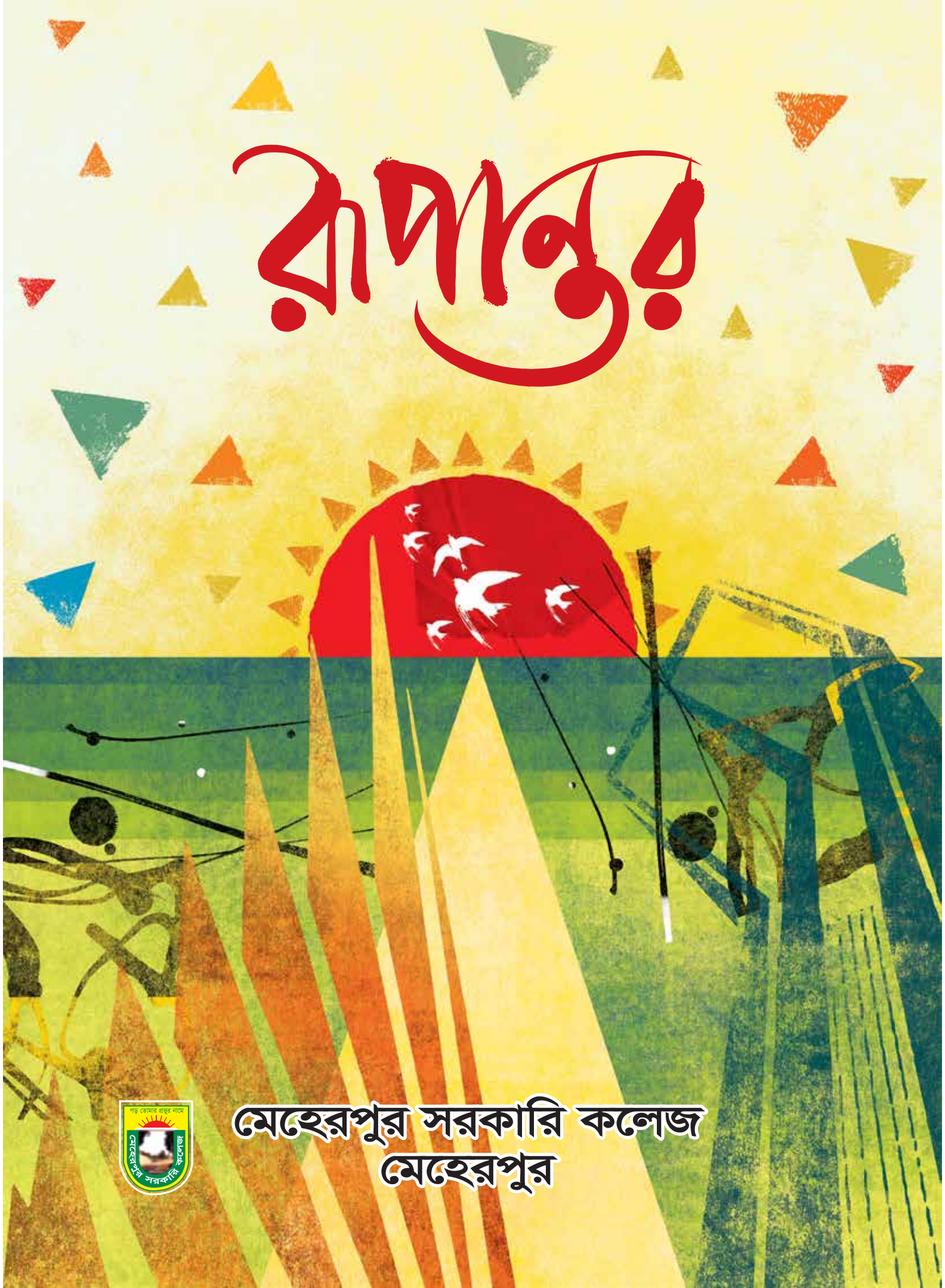

মেহেরপুর সরকারি কলেজ
মেহেরপুর

# রূপান্তর

মেহেরপুর সরকারি কলেজ বার্ষিকী

[শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪]

## মেহেরপুর সরকারি কলেজ
## মেহেরপুর

# রূপান্তর

## মেহেরপুর সরকারি কলেজ বার্ষিকী

[শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪]


**প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা**

**প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর**
অধ্যক্ষ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

**ম্যাগাজিন প্রকাশনা কমিটি**

আহবায়ক
**আবদুল্লাহ আল-আমিন**, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সদস্য
**মো. খেজমত আলি মালিথ্যা**, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
**মনিরুজ্জামান**, প্রভাষক, ইংরেজি
**ওমর ফারুক**, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

**সম্পাদক**

**আবদুল্লাহ আল-আমিন**

**সম্পাদনা পরিষদ**

**মো. খেজমত আলি মালিথ্যা**, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
**মনিরুজ্জামান**, প্রভাষক, ইংরেজি
**ওমর ফারুক**, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

**প্রচ্ছদ**

মোস্তাফিজ কারিগর

**অলংকরণ**

ফারুক আহমেদ

**অক্ষরবিন্যাস**

**মেহেদী হাসান ও জাহিদুল ইসলাম**

**প্রকাশক**

মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

**মুদ্রণ সংখ্যা:** ৭০০ কপি

**প্রকাশকাল**

জুন ২০২৪ / আষাঢ় ১৪৩১

**RUPANTAR**
[Meherpur Govt. College Magazine June 2024], Published by Meherpur Govt. College, Meherpur, Chief Patron & Advisor: Dr. A. K. M. Nazrul Kabir, Editor: Abdullah Al Amin, Editorial Board: Md. Khejmat Ali Malitha, Moniruzzaman & Omar Faruque.

# উৎসর্গ

যে সকল শিক্ষাবিদ, শিক্ষাতাত্ত্বিক ও
শিক্ষক শিক্ষায় রূপান্তর ঘটিয়ে
বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে
কাজ করে চলেছেন
তাঁদের করকমলে।

# সূচিপত্র


**বাণী**

অধ্যক্ষ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর ০৫

**প্রাক-কথন-** আবদুল্লাহ আল-আমিন ০৬

**বিশেষ প্রতিবেদন**

মেহেরপুর সরকারি কলেজ: মানবসম্পদ সৃজন, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার প্রাণকেন্দ্র ০৯

**প্রবন্ধ**

বাংলাদেশে তীব্র তাপপ্রবাহ: আমাদের করণীয় ◆ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর ১১

অন্নদামঙ্গল কাব্যে মেহেরপুরের গ্রাম-জনপদ ◆ মুহ. আনসার উল- হক ১৬

দীনেন্দ্রকুমার রায় : এক বিস্মৃতপ্রায় লেখক ◆ আবদুল্লাহ আল-আমিন ২১

নাসরীন জাহানের ছোটগল্প: নৈঃসঙ্গ্য ও বিবিক্তির রূপায়ণ ◆ মঈনুল ইসলাম ২৮

**নিবন্ধ**

বাংলা প্রবাদ-প্রবচন: সমাজ বাস্তবতার সেকাল-একাল ◆ মো. খেজমত আলি মালিথ্যা ৩৪

বাঙালির চিন্তাজগতের ত্রয়ী নক্ষত্র ◆ বশির আহাম্মেদ ৩৬

**কবিতা**

মহা. আব্দুর রাজ্জাক/ মনিরুজ্জামান/ ফারজানা জুঁই / রাফি উদ্দিন / অনিক হাসান/ শর্মিলা আক্তার বৃষ্টি/ নাফিয়া ইসলাম/ তামিমা বিশ্বাস রিয়া /খসরু ইসলাম ৩৮

**গল্প ও অনুগল্প**

বিদায় ◆ মো. হাবিবর রহমান ৪৪

সুন্দরবন এক্সপ্রেস ◆ খসরু ইসলাম ৪৬

ফোন বন্ধের বার্তা ◆ মো. মিলন হোসেন ৪৮

নীরব শক্তি ◆ তানজিফ রহমান অর্পণ ৫১

দুরন্তপনা ◆ মুন্তাকিম আল-সাবিক ৫২

কর্মফল ◆ মো. মিলন হোসেন ৫৪

**সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত**

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সিংয়ের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা ◆ ড. সঞ্জয় বল ৫৫

**খেলাধুলা**

খেলাধুলা নিয়ে কিছু কথা ◆ মো. আলমগীর হোসেন ৬০

**স্মরণ**

কাবিল স্যার: তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম ◆ মো. নাহিদ আনদালিব ৬২

**পাঠগৃহ**

কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহারের উপকারিতা ◆ মো. শহীদুল ইসলাম ৬৪

**কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ:** মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৬৫

**কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ:** মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৬৮

**ম্যাগাজিন প্রকাশনা কমিটি-২০২৪:** মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭১

**শিক্ষক পরিষদ (২০২৩-২০২৪):** মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭২

**কলেজ এ্যালবাম:** মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭৩

**প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর**
অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

## বাণী

ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের পুণ্য পাদপীঠ মুজিবনগর-খ্যাত মেহেরপুর জেলার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর সরকারি কলেজ বাষট্টি বছর ধরে উচ্চ শিক্ষার বিকাশ, বিস্তার ও সামগ্রিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ কলেজ মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে আসছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সেবা সহজীকরণ, একাডেমিক সমৃদ্ধি অর্জন ও শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কলেজ ওয়েবসাইটটির আধুনিক সংস্করণ চালু করা হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী পাঠদান নিশ্চিত করতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-সংবলিত শ্রেণিকক্ষ, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত ল্যাব এবং পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই ও জার্নালে সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিসহ ৮টি সেমিনার লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষকদের বেসিক আইসিটির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সমগ্র ক্যাম্পাসকে নেটওয়ার্কিং ও সিসিটিভির আওতায় আনয়ন, মাদার কর্ণার স্থাপন, অভিবাবকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত পাঠ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে বার্ষিক একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান। আশা করছি, এসব উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ছায়া সুনিবিড় বৃক্ষরাজি, সবুজ চত্বর, একাডেমিক কার্যক্রম ও আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে উদ্ভাসিত ভবনসমূহ জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী-অভিবাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণে ও শিখনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইতিহাসের নানা পর্বে অত্র কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা এ জনপদে জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনে ও জেলার গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল করতে সহায়তা করেছে। নানামাত্রিক ভূমিকা পালনের জন্য মেহেরপুর সরকারি কলেজ এখন এ জনপদের শিক্ষানুরাগী তথা সর্বস্তরের মানুষের গর্বের প্রতিষ্ঠান। এ বছর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের লেখালেখি নিয়ে 'রূপান্তর' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে পেরে আমি অতুলনীয় আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। আশা করি, আগামী দিনেও শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশে এ ধরনের কার্যক্রম ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

'রূপান্তর' সম্পাদনা পরিষদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

**(প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর)**

# প্রাক-কথন

চারদিকে এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথা সোশ্যাল মিডিয়ার দারুণ দাপট। সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে বদলে গেছে মানুষের রুচি-মূল্যবোধ, লাইফস্টাইল-ফ্যাশানের ভূগোল। তরুণ পড়ুয়ারা এখন আর দলগতভাবে শ্লাঘার সঙ্গে ছোটকাগজ, ভাঁজপত্র কিংবা ম্যাগাজিন বের করে না। গোটা দুনিয়ার মতো বাংলাদেশের তরুণরাও এখন ডিজিটালনির্ভর। তারা অনলাইনে বই পড়ে, বই কেনে, সাহিত্যচর্চা করে ফেসবুক কিংবা ওয়েব ম্যাগাজিনে, গান শোনে ইউটিউবে এবং সিনেমা দেখে নেটফ্লিক্সে। তরুণ লেখকরা লিখছেন ফেসবুক, ওয়েব ম্যাগাজিন কিংবা বিভিন্ন ব্লগে। প্রিন্ট মিডিয়ায় যিনি লিখতেন তিনিও এখন অনলাইন মিডিয়ায় তাঁর বই ছাপাচ্ছেন মনের আনন্দে। আন্দাজ করা মুশকিল হলেও অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে তাঁরাও হয়তো ফেসবুক-ইনস্টগ্রামে সক্রিয় হতেন। তাঁদেরও হয়তো চেতন ভগত-দুর্জয় দত্তের মতো লাখ লাখ 'ফলোয়ার' থাকতো! 'একটি কবিতার জন্য অহর্নিশ প্রতীক্ষা' না-করে নিজ খরচে আমাজনের 'ক্রিয়েট স্পেসে' প্রতিদিন পোস্ট করতেন 'মিল্ক অ্যান্ড হানি'র মতো জনপ্রিয় সব কবিতা। মুহূর্তেই পেয়ে যেতেন শাহরুখ খানের মতো ব্লক বাস্টার জনপ্রিয়তা। নির্মলেন্দু গুণ, আনিসুল হক, সাদাত হোসাইন কিংবা পশ্চিমবঙ্গের সুবোধ সরকার-শ্রীজাত'র মতো জনপ্রিয় কবিরা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দারুণ ব্যস্ত। কানাডাপ্রবাসী ভারতীয় লেখক রুপি কাউরের পথ ধরে বাংলাদেশের কবিরা কেউ কেউ ইনস্টাগ্রামে লিখছেন 'ইনস্টাপোয়েট্রি' বা 'ইনস্টাকবিতা'। স্টাইল ও ফর্মের দিক দিয়ে নতুন ধারার এই কবিতা ফেসবুক, টিকটক এমনকি টুইটারেও প্রকাশিত হচ্ছে। এসব কবিও পেয়ে যাচ্ছেন কবিখ্যাতি, স্বল্প সময়ের মধ্যে বনে যাচ্ছেন সেলিব্রিটি লেখক। তাহলে, এখন কী হবে? প্রযুক্তি কী মানুষের মনোজগতটা গিলে খেয়ে ফেলবে! মানুষ কী তাহলে গ্যালারিতে হাজির হয়ে নান্দনিক শিল্পকর্মের আলো-আঁধারিতে শিহরিত হবে না? কবিতার লাবণ্যমাখা শরীর দেখে কোনো তরুণ কি আর মুগ্ধ হবে না! কি জানি, হয়তো হবে, আবার নাও হতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি সংবাদপত্রের পাতা থেকে সাহিত্য সাময়িকীর পাতা প্রায় উধাও করে দিয়েছে, ছাপাখানা, প্রিন্ট মিডিয়া, মুদ্রণশিল্পের কদর কমিয়েছে কয়েকগুণ। বইপড়াও ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে তরুণরা। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমে আর বই রাখার আলমারি শোভা পায় না। পাবলিক লাইব্রেরির চেয়ারে বসে বই পড়ার দিন ফুরাতে বসেছে। বাস্তবিক অর্থেই জ্ঞানতৃষ্ণার প্রতি, বইয়ের প্রতি মানুষের আবেগ কমে যাচ্ছে। হাল জামানার বইবিমুখ এই কিশোর তরুণদের দিকে তাকিয়ে বুকারজয়ী লেখক হাওয়ার্ড জ্যাকবসন সখেদে বলেছেন, 'ফেসবুক-টুইটার শিশুদের মূর্খ বানিয়ে ছাড়বে'! ফেসবুক-টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষকে মূর্খ বানাতে পারবে কিনা জানি না, তবে কিছুটা হলেও বইবিমুখ বানিয়ে ছেড়েছে। বইয়ের পাতা উল্টানো আঙুলগুলো এখন স্মার্টফোনের রূপালি পর্দায় স্ক্রলিংয়ে অষ্টপ্রহর দারুণ ব্যস্ত। ফেসবুকে-টুইটারে চ্যাট করার পর বইপড়ার সময় কোথায়! যে স্তব্ধ দুপুর কিংবা বিষণ্ন বিকেলে মানুষ কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়ে অবসর যাপন করতো, সেই অবসর-সময় দখল করে নিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। মানুষের অবসর সময় ঢুকে গেছে ফেসবুকের নীল দুনিয়ায়, টুইটারের কলরবে, ইনস্টাগ্রাম নামক অনলাইন গ্রামে। ফলে কমে যাচ্ছে বইপড়া, প্রেক্ষাগৃহে বসে সিনেমা দেখা এবং লেখালেখির যাবতীয় অভ্যাস। প্রিন্ট মিডিয়া,

ছোটকাগজ, দেওয়াল পত্রিকার অবস্থা লণ্ঠনের নিবু নিবু আলোর মতো। আমাদের মন-মগজ দখল করে নিয়েছে নতুন নতুন ডিভাইস। এহেন জটিল ও বৈরী সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে কলেজ-বার্ষিকী 'রূপান্তর' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশ করেছিল 'সুবর্ণরেখা'। 'সুবর্ণরেখা'র রুচিশীল প্রচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, অলংকরণ এবং বিষয় ও বিষয়ান্তর ভাবনার গভীরতা পাঠকসমাদৃত হয়েছিল। ওই একই উদ্দীপনা ও সাহিত্যরুচি নিয়ে এবার প্রকাশিত হচ্ছে 'রূপান্তর'। 'রূপান্তর'-এর পাতায় পাতায় থাকছে সৃজন-আনন্দ, উন্নতমানের সাহিত্যসম্পদ, বিজ্ঞানচিন্তা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনার নতুন বার্তা।

শিক্ষক হিসেবে আমরা স্বপ্ন দেখি, আমাদের ছাত্ররা এখানে পড়বে, চিন্তা করবে, স্বপ্ন দেখবে। দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিভার দ্যুতি ছড়াবে। সমাজ রূপান্তরে ভূমিকা পালন করবে, অভিযোজন-সক্ষম প্রজন্ম হিসেবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া, সাহিত্য-সংগীত, নাটক, আলোকচিত্র, সামাজিক ব্যবসা-সহ নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। প্রথাগত শিক্ষার পীড়নে কিংবা প্রযুক্তি আসক্তিতে তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাচর্চা ভোঁতা হয়ে যাক, এটা আমরা চাই না। আমরা চাই, তারা সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে উঠুক। চিন্তার বৈকল্য, বুদ্ধির জড়তা, স্বপ্নের দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসে তারা জয়ী হোক। আমার বিশ্বাস, 'রূপান্তর' মেধাবী, চিন্তাশীল ও স্বপ্নবান তরুণদের চিত্তে ও চেতনায় সামান্য হলেও সৃষ্টিশীলতার আলো ছড়াতে পারবে।

বার্ষিকীর বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ করতে নানাজন নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন চারুশিল্পী মোস্তাফিজ কারিগর। তাঁদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। পত্রিকা প্রকাশনায় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর-এর অবদান অপরিসীম। তাঁর আগ্রহ, আনুকূল্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া ম্যাগাজিনটি আলোর মুখ দেখতো না।

পেশাগত নিষ্ঠা ও সতর্কতা অবলম্বন করে ম্যাগাজিনটি মুদ্রিত হয়েছে। তারপরও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ, সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু না। ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আগাম মার্জনা চেয়ে রাখছি। ম্যাগাজিনটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের সহকর্মীদের অবদান অপরিসীম। সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্বে যাঁরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

**(আবদুল্লাহ আল-আমিন)**

# মেহেরপুর সরকারি কলেজ

## মানবসম্পদ সৃজন, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার প্রাণকেন্দ্র

মেহেরপুর, অবিভক্ত বঙ্গদেশের এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। উনিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগে মহকুমা প্রশাসকের প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মধ্যদিয়ে 'মেহেরপুর' নামক বর্ধিষ্ণু গ্রামটি শহর হয়ে ওঠে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে জেগে ওঠা এই নতুন শহরে ১৮৫৪ সালে শিক্ষানুরাগী জমিদার ব্রজকুমার মল্লিকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি মধ্য-ইংরেজি স্কুল। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন-আরোহণের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি এন্ট্রান্স স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী, সচেতন জনগণ মেহেরপুর শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে, কিন্তু আর্থিক সহযোগিতা ও উদ্যোগের অভাবে কোনো কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। বাধ্য হয়ে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য কৃষ্ণনগর কিংবা কলকাতায় যেতে হত। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর মেহেরপুরের সাধারণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের দরজাটা রুদ্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে মেহেরপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল এ জনপদের জনগণের প্রাণের দাবি। দেশভাগের পনের বছর পর ১৯৬২ সালে 'মেহেরপুর মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জনগণের সেই দাবিটি পূরণ হয়। পূর্ববঙ্গের একটি সীমাবর্তী এলাকার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরের শিক্ষানুরাগী, সমাজহিতৈষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুর কলেজ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কীভাবে একটি জনপদের সমাজ রূপান্তর, স্বপ্ন পূরণ, মননচর্চা ও মানবসম্পদ সৃজনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে কেবলই মেহেরপুর কলেজ। এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকরণ, উচ্চায়ত চিন্তাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃজন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষার বিস্তারে কলেজটির অবদান অপরিসীম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি জনপদের মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনা বিকাশেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৬২ সালের ২২ জুলাই/ আষাঢ় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় তৎকালীন মহকুমা হাকিম নুরুন্নবী চৌধুরী সিএসপি'র মাধ্যমে। সেই থেকে প্রতিষ্ঠানটি আলো ছড়িয়ে চলেছে গ্রাম থেকে শহরে, এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে। প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন রফিকুল আলম। তিনি ছিলেন একাধারে সফল প্রশাসক ও কৃতী শিক্ষক। কলেজ পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন মহকুমা প্রশাসক নুরুন্নবী চৌধুরী সিএসপি এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পেয়েছিলেন খ্যাতিমান আইনজীবী এডভোকেট আবুল হায়াত ।

সূচনালগ্নে মেহেরপুর মডেল হাইস্কুলে কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রায় দুই বছর যাবৎ কলেজের একাডেমিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় মডেল হাইস্কুল থেকে। ১৯৬৪ সালের প্রারম্ভে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের পূর্ব দিকে কলেজের নির্ধারিত স্থানে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৬৪ সালের শেষদিকে কলেজের একাডেমিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম মডেল হাইস্কুল থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৫ সালে ৮ হাজার ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়। ওই একই বছর মেহেরপুর কলেজ ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় থেকে স্নাতক কলেজে রূপান্তরিত হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি লাভ করে। ১৯৬৬ সালে বিএ, বিকম এবং ১৯৬৭ সালে বিএসসি পাস কোর্স চালু হয়। ১৯৭৯ সালের ৭ মে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। কলেজ জাতীয়করণকালে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন শহীদুল্লাহ খান। পাণ্ডিত্যে, প্রশাসনিক দক্ষতায় ও নেতৃত্বের গুণাবলীতে তিনি ছিলেন অনন্য। ১৯৯৯ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। বর্তমানে ৮টি বিষয়ে অনার্স এবং ৬ বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। স্নাতক পাস কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে মাস্টার্স প্রথমপর্ব ও প্রাইভেট মাস্টার্স কোর্স চালু ও ১১২ টি শিক্ষকের (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক) পদ সৃজনের প্রচেষ্টা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১৯৬২ সালে অল্প কজন শিক্ষার্থী নিয়ে মেহেরপুর কলেজের যাত্রা শুরু। এখন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছয় হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে।

### মুক্তিযুদ্ধে মেহেরপুর কলেজ

ষাটের দশকের বাঙালির সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশ, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, স্বাধীকার আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে সত্তর দশকের অসহযোগ আন্দোলনে মেহেরপুর কলেজের শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক-হানাদার বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন এ কলেজের অসংখ্য শিক্ষার্থী। কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আবুল কাশেম কুমিল্লায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে শহীদ

হন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৯ ও ২০ এপ্রিল কলেজের বিশাল এলাকা দখল করে ক্যাম্প স্থাপন করে বিজ্ঞান ভবনের নিচতলাকে ব্যবহার করে ইন্টারোগেশন সেল হিসেবে। কলেজের একমাত্র ছাত্রাবাসটি পরিণত হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কসাইখানায়। কলেজের উত্তরের বধ্যভূমিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক নিরীহ ও মুক্তিকামী বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ৬-ডিসেম্বর মেহেরপুর মুক্ত হলে অসংখ্য শহীদের দেহাবশেষ কলেজ চত্বরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এদের দেহাবশেষ একত্রিত করে কলেজ মোড়ের গণকবরে সমাহিত করা হয়। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি এই গণকবরের ওপর নকশাবিদ ইদ্রিস আলী খাঁন-এর নকশা অনুযায়ী একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। ২০০০ সালের ২৫ মার্চ পূর্বের স্মৃতিসৌধটি ভেঙে আবু হেনা মোস্তফা কামালের নকশা অনুসারে নতুন আঙ্গিকে স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়। এই স্মৃতিসৌধের মর্মবাণী 'প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা'।

## শিল্প-সাহিত্য-ক্রীড়া-সংস্কৃতিচর্চায় মেহেরপুর কলেজ

শিল্প সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্রীড়াচর্চার ক্ষেত্রে এ কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। ষাটের দশকের শেষদিকে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলিত উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' এবং ১৯৭৩ সালে কলেজ ছাত্রসংসদের উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' এর মতো ক্ল্যাসিক নাটক মঞ্চস্থ হয়। আশির দশকে মঞ্চস্থ হয় কল্যাণ মিত্রের 'পাথর বাড়ি' ও 'সাগর সেচা মানিক', 'কবর'। অধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল করিম, কবি শামসুর রাহমান ও গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে কলেজের আম্রকাননে উদযাপিত হয় বসন্ত উৎসব। মেহেরপুর সরকারি কলেজ থিয়েটার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল হলে নাটক '৬ ডিসেম্বর' ও ২০১৪ সালে জাতীয় নাট্যশালায় 'নীল বৈঠক' সফলভাবে মঞ্চস্থ করে। বাংলাদেশের খ্যাতিমান-কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের অনেকে এ কলেজের অধ্যয়ন করেছেন। নব্বই-এর দশকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সরকারি কলেজ তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২৩ সালে বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃকলেজ কাবাডি প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মিলিত উদ্যোগে ২০১৭ সালে 'যুগপত্র' এবং ২০১৮ সালে 'শব্দতরু' নামে দুটো স্যুভেনির প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হয় 'সুবর্ণরেখা'। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০২২। কলেজের পিঠাপুলি উৎসব জেলার সংস্কৃতিজনদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। ২০২৪ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে বিপুল উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৪ উদযাপিত হয়েছে সাড়ম্বরে, জেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান মনোনীত হয়েছেন কলেজের প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর।

## জনজাগরণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে মেহেরপুর কলেজ

ষাটের দশক থেকেই জেলার ছাত্ররাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে মেহেরপুর কলেজ, ছাত্রছাত্রীদের দাবি আদায়ের লক্ষে গড়ে ওঠে কলেজ ছাত্রসংসদ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মননশীল ও

সৃজনশীল ভাবনার বিকাশে, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে মেহেরপুর কলেজ ছাত্রসংসদ পালন করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। কলেজের ছাত্র সংসদকে ঘিরে এ জেলায় সংগঠিত হয় গণমুখী শিক্ষা আন্দোলন ও স্বাধিকারের লড়াই। স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জনজাগরণে কলেজ ছাত্র সংসদের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। ১৯৬৬ সালে মেহেরপুর কলেজ ছাত্রসংসদের প্রথম নির্বাচনে ভিপি পদে গোলাম কবীর খান ও জিএস পদে আলাউদ্দীন নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে ভিপি ও জিএস পদে যথাক্রমে ছাত্রলীগের শাহাবাজ উদ্দিন নিজ্জু ও আব্দুর রব, ১৯৬৮ সালে ভিপি ও জিএস পদে যথাক্রমে ছাত্রলীগের তোফাজ্জেল হোসেন ও আব্দুর রশিদ নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে ভিপি ও জিএস নির্বাচিত হন ছাত্রলীগের হাশেম আলী ও আনিসুর রহমান আনিস। ১৯৮০ সালে ভিপি ও জিএস পদে নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হন মো.আবদুল্লাহ ও সিরাজুল ইসলাম। পরে তারা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে ভিপি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী মুজিবুল হক খান চৌধুরী হেলাল (পরবর্তীকালে ছাত্রদলে যোগদান করেন) ও জিএস পদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আয়ুব হোসেন নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ভিপি ও জিএস পদে বিজয়ী হন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আব্দুল মান্নান ও আতাউল হক আন্টু। ১৯৯২ সালে ভিপি ও জিএস পদে ছাত্রদলের কাজী আজিজুল ইসলাম টোকন ও আহসানুজ্জামান-বাদল নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে ভিপি পদে বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর জাহাঙ্গীর বিশ্বাস ও জিএস পদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বিজয়ী হন। ১৯৯৪ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন ও সোহেল আহমেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়। ১৯৯৫ সালে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ভিপি পদে বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর আবদুল হালিম ও জিএস পদে ছাত্রলীগের আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ তোতন নির্বাচিত হন। এরপর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তারপরও জেলার গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত শক্তিশালী করতে এ কলেজের ছাত্ররা অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

## কলেজের স্থাপনা ও ভবনসমূহ

১৯৬৪ সালে সরকারি ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের অর্থায়নে নির্মিত হয় কলেজের মূল প্রশাসন ভবন। ১৯৬৫ সালে সাপ্লিমেন্টারি স্কিমের আওতায় ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে মূল ভবনের পূর্বদিকে বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়। ১৯৬৬ সালে কলেজের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সরকারি অর্থায়নে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে ছাত্রাবাসটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়, কিন্তু সরকারি বিধি-নিষেধ ও নানা রকম সামাজিক সমস্যার কারণে নতুন কোনো ছাত্রাবাস নির্মিত হয়নি। ১৯৯১ সালে নির্মাণ করা ছাত্র সংসদ ভবন। ২০১৬ সালে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে নির্মিত হয় আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর পাঁচতলা বিশিষ্ট একাডেমিক কাম পরীক্ষা ভবন ও চারতলা বিশিষ্ট প্রশাসন ও কম্পিউটার ল্যাব ভবন। ২০১৯ সালে নির্মিত হয় পাঁচতলা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস 'শেখ হাসিনা হল'। হলের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। একাডেমিক ভবনের সামনে রয়েছে বিশাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভেষজ বাগান, বৈশাখী চত্বর ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। প্রশাসন ও কম্পিউটার ল্যাব ভবনে স্থাপন করা হয়েছে সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব।

গত শতকের ষাটের দশকে বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের মহেন্দ্রক্ষণে মেহেরপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও উচ্চশিক্ষাচর্চার ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের জনজীবনে যুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা, সাধারণ মানুষ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে জেগে ওঠে উচ্চশিক্ষা অর্জনের এক অদম্য আকাঙ্খা। শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের বহুমাত্রিক কর্মতৎপরতায় মেহেরপুর শহরে সৃষ্টি হয় নতুন ধারার উচ্চায়ত সংস্কৃতি ও সামাজিক বাতাবরণ। রাজনৈতিক-সামাজিক ভাঙাগড়ায়, সময়ের পরিক্রমায় শহরের অনেক কিছুই বদলে গেছে। কিন্তু কোনো পরিবর্তনই মেহেরপুর কলেজের ঔজ্জ্বল্য ম্লান করতে পারেনি। আশা করা যায়, আগামী দিনেও মেহেরপুর সরকারি কলেজ জেলার প্রধান ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠ হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র: মেহেরপুর সরকারি কলেজ মহাফেজখানা

গ্রন্থনা: সম্পাদক, কলেজ বার্ষিকী রূপান্তর

# বাংলাদেশে তীব্র তাপপ্রবাহ: আমাদের করণীয়

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। ভৌগোলিকভাবে দেশটি ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০°৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশটি ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলে অবস্থিত যা নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রার দেশ হিসেবে পরিচিত। বিগত কয়েক বছরে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সেই পরিচিতি একবারে ম্লান করে দিয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানও তীব্র তাপ প্রবাহে ভূমিকা রাখছে।

যে কোনো দেশের মোট ভূমির শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে বন উজাড়ের ফলে বর্তমানে বনভূমির পরিমান রয়েছে মোট ভূমির শতকরা ১১-১২ ভাগ। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পরবর্তী মাথাপিছু বনের পরিমাণ ০.৩৮ হেক্টর থাকলেও বর্তমানে রয়েছে মাত্র ০.০২ হেক্টর। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রায় ২ লাখ ৫৭ হাজার একর বনভূমি জবরদখল হয়েছে। পরিবেশ অনুকূল রাখতে প্রতি হেক্টর জমিতে অন্তত ০.০৫ হেক্টরে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা থাকতে হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে বনভূমি হিসেবে স্বীকৃত ভূমিতে উপযুক্ত পরিমাণ বৃক্ষ নেই। সারা বিশ্বেই নির্বিচারে বন উজাড় হচ্ছে। প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে ২ হাজার ৬০০ হেক্টর বন উজাড় হচ্ছে যা সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০০০-২০২৪ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে বন উজাড়ের হার প্রায় ১.৪% হলেও বাংলাদেশে এ হার ২.৬%।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যতটা দায়ী তার চেয়ে সর্বোচ্চ কার্বন নির্গমনকারী উন্নত দেশগুলো বেশি দায়ী। ফলে এর নেতিবাচক প্রভাবের নির্মম শিকার বাংলাদেশের মতো দেশগুলো। কিন্তু বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাব মোকাবিলায় যা করণীয় এখনও তা থেকে আমরা অনেকটা দূরে আছি। অনেকের অবিবেচক কর্মকাণ্ডের খেসারত বাংলাদেশকে হাড়ে হাড়ে দিতে হচ্ছে। এ বছর দেশব্যাপী তীব্র তাপদাহ হচ্ছে এর বাস্তবতা।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ যেমন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, লাওস, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামসহ ১১টি দেশ কয়েক বছর ধরে শুষ্ক মৌসুমে তীব্র তাপদাহে পুড়ছে। এসব দেশে বিগত বছরের প্রতি মাসেই মোটামুটি তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে চলেছে। বিগত ৫৮ বছরের রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সম্মুখীন হলো বাংলাদেশের জনগোষ্ঠি। বাংলাদেশে এ চরম তাপমাত্রা ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং যা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৪৫° সে. এ উঠেছে, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার অনেক বেশি। ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডও ৪২° সে. তাপমাত্রার বার্তা মিলেছে। এই চরম তাপপ্রবাহ মানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি তৈরি করছে, কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতি করছে, জলপ্রবাহের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা সৃষ্টি করছে। যার ফলশ্রুতিতে হিটস্ট্রোকে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে। বিশেষজ্ঞরা এই চরম তাপপ্রবাহকে পরিবেশের বিরুদ্ধে মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিণতি বলে মনে করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে তীব্র তাপমাত্রার বিষয়টি একটি গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে যার প্রভাব বহুমুখী এবং মারাত্মক। এ ধরনের চরম এবং অস্বস্তিকর তাপপ্রবাহ দ্বারা প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুল উভয়ই হুমকির মধ্যে পড়েছে। এছাড়াও ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকেও নাজুক করে তুলেছে। এ ধরনের তীব্র তাপ প্রবাহের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এই তাপদাহে আক্রান্ত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষ যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এরকম তাপপ্রবাহে উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ। সামনের দিনগুলোতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা আরও বাড়বে। অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে চরম তাপপ্রবাহের সাথে খাপ-খাওয়াতে না পারার কারণে মানুষের মৃত্যুর হার বাড়বে। আগে মানুষের মৃত্যু হতো তীব্র শৈত্যপ্রবাহে তবে এখন এমন একটি যুগ শুরু হয়েছে, যেখানে মানুষের মৃত্যু ঘটবে তীব্র তাপদাহের কারণে।

বিশ্বের ৯.৪% মানুষের মৃত্যুর জন্য সরাসরি দায়ী এই অস্বাভাবিক তাপমাত্রা। বিশ্বব্যাংকের মতে বিগত ৫৮ বছরে বাংলাদেশের ঢাকার গড় তাপমাত্রা ০.৫° সে. বেড়েছে, যেখানে চট্টগ্রামে একই সময়ে বেড়েছে ০.৯° সে. এক গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতি দশকে বাংলাদেশসহ প্রায় ৪৪টি দেশের তাপমাত্রা বেড়েছে ০.২৬° সে. করে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী ২০৫০

খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪° সে. এবং ২১০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ২.৪° সে. বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ২০২১ সালের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ তাপমাত্রা বৃদ্ধি কোথায় গিয়ে থামবে তার ভবিষ্যদ্বাণী পরিবেশ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা আপাতত অনুমান করতে পারছেন না।

অন্যান্য বছর বাংলাদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বাতাসে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ আর্দ্রতা থাকতো। কিন্তু এবার বাতাসে আর্দ্রতা ছিল মাত্র শতকরা ২৫-৩৫ ভাগ। এ কারণে শরীরের চামড়া পুড়ে যাওয়ার মতো গরম অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া ও পরিবেশবিদরা মনে করেন যদি আমরা জলবায়ু নিয়ে সতর্ক না হই তাহলে মানুষের জন্য সামনে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ অবস্থা। এভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তন হতে থাকলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঘটনা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। মানুষ অল্প বয়সেই শুধু তাপমাত্রার বিরূপতার শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে।

বনভূমি হলো পৃথিবীর ফুসফুস। বনের কাজ হলো বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহকে শোষণ করা, সেই বন আমরা নির্বিঘ্নে উজাড় করে ফেলছি। বনভূমি কার্বন শোষণের পাশাপাশি এর গাছগুলো ছায়া সরবরাহের মাধ্যমে মাটিকে আর্দ্র রাখে। তাতে পরিবেশ থাকে সুরক্ষিত। বাংলাদেশে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধির প্রধান কারণ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, যার জন্য উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোকেই দায়ী করা হয়। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন দায়ী হলেও বাংলাদেশে পরিবেশ বিধ্বংসী কিছু কর্মকাণ্ড যেমন অপরিকল্পিত নগরায়ন, সবুজ গাছপাল নিধন, নদী-খালবিল দখল, পাহাড়-টিলা ধ্বংস, এয়ার কন্ডিশনের ব্যবহার বৃদ্ধি, সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ ইত্যাদি তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়াও অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা স্থাপনসহ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির ফলে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

জলবায়ুর এ ধরণের পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে তীব্র তাপদাহের পাশাপাশি নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তন্মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন এবং ভূমিধ্বসের মাত্রাবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। আগে ১৫ কিংবা ২০ বছর পরপর বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও বর্তমানে ২ থেকে ৩ বছর পরপরই বড় ধরনের দুর্যোগ হানা দিচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার আগে। দিন দিন বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, সময়মত হচ্ছে না বন্যা। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর চরমভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে।

### তীব্র তাপদাহের সম্ভাব্য কারণসমূহ

শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বায়ুমণ্ডলকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। এ কারণে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ ঘটছে। তাই এসব দেশসমূহ ক্রমশ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এর প্রভাবে খরা, তীব্র তাপপ্রবাহ এবং বন্যার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশে চরম তাপপ্রবাহের প্রাথমিক কারণ হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন যা প্রধানত কার্বন গ্যাস নির্গমনের কারণে ঘটছে বলে মনে করা হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, বনভূমি ধ্বংস এবং শিল্প-কারখানা পরিচালনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের মতো অরক্ষিত দেশগুলো। গাছপালা নিধন, নগরায়ণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাইতে উন্নত দেশগুলোর দায় বেশি। একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০৫০ সালের মধ্যে তাপপ্রবাহ বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩.৫ বিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবন ও জীবিকার মারাত্মক প্রভাব ফেলবে এবং তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে শহরে বসবাসকারী মানুষ। নিম্নে তীব্র তাপদাহের উল্লেখযোগ্য কারণ উল্লেখ করা হলো:

- অপরিকল্পিত নগরায়ন, নগরে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও অপরিকল্পিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
- যানবাহনের ধোঁয়া ও যানজট সমস্যা এবং কলকারখানার নির্গমন বায়ু দূষণ বৃদ্ধি করছে যা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।
- পিচঢালা রাস্তা দিনের বেলা উত্তপ্ত হয় এবং রাতের প্রথমভাগ পর্যন্ত তাপ ধারণ করে থাকে। এরপর যখন তা রিলিজ করে তখন তা তাপ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
- বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে অনেক নদী মরে গিয়েছে এবং কিছু নদী বালু ভরাট হয়ে

বিলুপ্ত হয়েছে ফলে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ তাপ ছড়িয়ে পড়ছে যার কারণে আশে পাশের অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- বর্তমান নগরায়ন, শিল্পায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম এবং অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বহুতল ভবনগুলোতে অতিরিক্ত গ্যাসের ও এয়ারকুলারের ব্যবহারও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।
- ঢাকাতে বছরে অসহনীয় গরম দিনের সংখ্যা বিগত ছয় দশকে অন্তত তিনগুণ বেড়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বিগত ২৮ বছরে ঢাকা থেকে ২৪ বর্গকিলোমিটারের সমআয়তনের জলাধার ভরাট করে ফেলা হয়েছে এবং ১০ বর্গকিলোমিটারের সমপরিমাণ সবুজ বন উজাড় হয়েছে বা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে কমে গেছে।
- পৃথিবীর ফুসফুস আমাজান ফরেস্ট নষ্ট হওয়া, উন্নত রাষ্ট্রগুলোর কার্বন নিঃসরণ ও জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- এল নিনো'র ফলেও বাংলাদেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে।

### তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব

তীব্র তাপদাহের প্রভাব ব্যাপক। তীব্র তাপ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন, হৃদরোগ, কিডনি রোগ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তীব্র তাপমাত্রার ফলে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা দিতে পারে:

- তীব্র তাপমাত্রার বৈরী আচরণের কারণে ফসল নষ্ট হওয়াসহ ফসলের উৎপাদন কমে যাবে যার ফলে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যনিরাপত্তার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং ভবিষ্যতে খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- তীব্র তাপের ফলে পুকুর, খাল, নদ-নদী ও জলাশয়ের পানি দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে ফলে নদীসমূহে পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্থ হবে এবং নৌযান চলাচল বিঘ্ন ঘটবে।
- তীব্র তাপপ্রবাহ বাংলাদেশে পানির ঘাটতির সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিবে যার ফলে নদী, হ্রদ এবং জলাশয়সহ ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা কমে যাবে।
- তীব্র তাপের কারণে বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করবে, এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন কমে যাবে, পর্যটন শিল্পে মন্দা দেখা দিবে যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হবে।
- তীব্র তাপদাহের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে যার ফলে জীববৈচিত্র্য ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, বনভূমি শুকিয়ে যাচ্ছে এবং মরুভূমিকরণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- চরম তাপদাহ হাস-মুরগি ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে ফলে এই সেক্টরের উৎপাদনশীলতাকেও চরমভাবে প্রভাবিত করবে।

### মানসিক স্বাস্থ্যের উপর তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব

চলতি মৌসুমের তাপপ্রবাহে সবচেয়ে বেশি নাকাল এশিয়ার দেশগুলো। বাংলাদেশের মতোই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীন উচ্চ তাপমাত্রার কবলে পড়েছে। যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে এতে মানুষের স্বাস্থ্য দিনকে দিন ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা রাখতে মানুষের শরীরে বাড়ছে রক্তপ্রবাহ। অতিরিক্ত ঘাম বের হওয়ার কারণে শরীর থেকে ইলেকট্রোলাইট বের হয়ে যাচ্ছে, যা সৃষ্টি করছে শরীরের পানিশূন্যতা। এছাড়াও শরীরের মেটাবলিক রেট কমে যাওয়ায় অক্সিজেন গ্রহণের হার কমে যাচ্ছে আর মানুষ অসহায়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অবধারিত মৃত্যুর দিকে।

তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে মানুষ হিটস্ট্রোক, বমি, ডায়রিয়া, মাথাব্যথা, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট এবং পানিশূন্যতা ইত্যাদি নানাবিধ স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নিয়ে দিনাতিপাত করছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাতাসের তাপমাত্রা যদি কোনো অঞ্চলের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চাইতে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে বাড়ে, তাহলে তাপজনিত অসুস্থ্যতার সংখ্যা ১৮ শতাংশ বাড়বে। ফলশ্রুতিতে হাসপাতালে মূত্রনালির সংক্রমণ ও কিডনির পাথরে ভোগা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। সম্প্রতি তীব্র তাপমাত্রার ফলে হাসপাতলগুলোতে হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যাজনিত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের সমস্যায় বয়স্ক এবং শিশুরা বেশী আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়াও তীব্র তাপমাত্রা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করছে। উচ্চ তাপমাত্রা মানবদেহে অ্যাড্রেনালাইন এবং আরও কিছু জৈব রাসায়নিকের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যার ফলে মানুষের মধ্যে নেতিবাচক আবেগ, ডিপ্রেশন, মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো, অধৈর্য হয়ে পড়া এবং আগ্রাসী আচরণ ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উচ্চ তাপমাত্রা আত্মহত্যার হারও বাড়ায়।

### তীব্র তাপদাহ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের শীর্ষ তালিকাভুক্ত দেশের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পরিবেশগত সুস্থতা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া যা রাতারাতি করা যায় না। এদেশে

বনভূমি উজাড়, ক্ষতিকারক শিল্পবর্জ্য নির্গমন, নদীর তীর দখলসহ পরিবেশগত অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও পরিবেশগত অপরাধের অভিযোগ পাওয়া যায় যা তাপমাত্রা বৃদ্ধির মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান তীব্র তাপপ্রবাহ আকস্মিক কার্যকলাপের ফল নয় বরং এটি দীর্ঘমেয়াদী মানুষ সৃষ্ট নানা ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তীব্র তাপদাহের প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী উভয় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং সাধারণ মানুষ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

এছাড়াও এই তীব্র তাপদাহের প্রভাব প্রশমিত করতে, বৈশ্বিক উষ্ণতার মূল কারণগুলোকে মোকাবিলা করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৈশ্বিক সংহতি গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই জরুরি এবং সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। এজন্য উন্নত দেশগুলোর দায়িত্ব হলো বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং প্যারিস চুক্তির মতো আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে প্রতিশ্রুতিগুলোকে সম্মান করা। আর বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর উচিত পরিকল্পিত কাঠামোতে শিল্প ও কল-কারখানার নিয়ন্ত্রিত প্রসার ঘটানো। শুধু সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি। নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেও আমরা তীব্র তাপদাহ থেকে রক্ষা পেতে পারি:

- তীব্র তাপপ্রবাহ শহরগুলোর জন্য বেশি বিপজ্জনক এবং প্রতি বছর শহরে ক্রমাগত ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ নিতে হবে তা হলো শহরের প্রতিটি ফাঁকা স্থানে গাছ লাগাতে হবে অথাৎ গ্রিনারি বা সবুজায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সবুজের পরিমাণ বাড়িয়ে নগরের ২৫-৩০ ভাগ সবুজায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- শহরের বহুতল ভবনগুলোতে ছাদ বাগান বৃদ্ধি করতে হবে এবং উত্তাপ কমানোর লক্ষে রাস্তার ডিভাইডারে শোভাবর্ধনকারী গাছ ছাড়াও বিভিন্ন ফলের গাছ, ঔষধি গাছ, কাষ্ঠল গাছ ইত্যাদি রোপণ করতে হবে।

- বায়ু দূষণ ও তাপপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিতভাবে নগরায়ন করতে হবে। শহরের স্থানীয়, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জননীতিকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। সর্বোপরি সবাইকে এই তাপপ্রবাহ কমানোর লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

- বনায়নের পাশাপাশি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য কংক্রিটের পরিমাণ কমাতে হবে। এছাড়াও তীব্র তাপদাহ থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রতিটি এলাকায় ভবনগুলোর চারিদিকে পর্যাপ্ত খালি জায়গা রাখা জরুরি। একই সঙ্গে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। অবকাঠামো নির্মাণের সময়ও সচেতন হতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ভবন নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি ভবনগুলোকে পরিবেশ বান্ধব করতে হবে।

- জলাভূমি ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করা-সহ দখলকৃত জলাভূমি উদ্ধার করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- শহরের সুবিধাগুলোকে শহরের বাইরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং শহরাঞ্চল থেকে মানুষের আধিক্য কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- যত্রতত্র প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য পোড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্লাস্টিক বর্জ্যকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে।

- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

- এলাকাভিত্তিক পুকুর বা জলাধার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও অপচয়রোধ করে পানি সংকট মোকাবিলা করতে হবে।

- সারাদেশে বন উজাড় রোধ ও বৃক্ষরোপণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং পাশাপাশি এ ব্যাপরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালাতে হবে।

- মানুষকে তীব্র তাপপ্রবাহের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং তাদের সাবধানতার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

- সরকারকে তাপপ্রবাহের শিকার মানুষদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আশ্রায়ণকেন্দ্র স্থাপন, শুষ্ক খাবার ও পানি বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

- বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- নিজেকে তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা, হালকা পোশাক পরা, বাইরে বের হওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা এবং নিয়মিত শরীর ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

- টেকসই জীবন-যাপন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পরিবেশের প্রতি সচেতন হতে হবে।

- সর্বোপরি পরিবেশকে সুস্থ্য রাখতে হলে জলবায়ু নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, বিশেষ করে মেট্রোরেলের মতো বিদ্যুৎ চালিত গণপরিবহন বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব ভবন নির্মাণে জোর দিতে হবে।

**শেষকথা**

বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে গ্রীষ্মকালে ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহের সাথে লড়াই করছে। ২০২৪ সালে তাপমাত্রা ৪৪-৪৫° সে. পর্যন্ত উঠেছে যা দেশের এখন পর্যন্ত উষ্ণতম বছর হিসেবে মনে করা হচ্ছে। তাপমাত্রার এ ধরনের বিপর্যয়ের ফলে জনসংখ্যা এবং জীববৈচিত্র্য উভয়ের জন্যই ঝুঁকি তৈরি করেছে। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন প্রকার নেতিবাচক মানব কর্মকান্ডের কারণে বাংলাদেশ আজ বিরূপ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এছাড়াও এই চরম আবহাওয়া বাংলাদেশের পরিবেশগত দুর্বলতা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান জড়িত তাদের দুর্বলতাও এর জন্য অনেকটা দায়ী। বাংলাদেশে পরিবেশ নিয়ে কাজ করে এমন বিভিন্ন পরিবেশগত সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবেশগত অপরাধ চিহ্নিত করেছে যেমন হাজার হাজার একর বনভূমি ধ্বংস করা, শিল্পকারখানা থেকে ক্ষতিকারক বর্জ্য নির্গমন এবং নদীর তীর দখল, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও পরিবেশগত অপরাধের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তাই বন উজাড়, পাহাড়-টিলা ধ্বংস, নদ-নদী ও জলাশয় ভরাট রোধ করতে হবে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। হাওরের বুকে ১৪ কিলোমিটার রাস্তায় আল্পনা তৈরির রেকর্ড না করে দেশে কয়েক কোটি গাছ লাগানো, টিকে থাকা পাহাড়-টিলাগুলোকে সংরক্ষণ ও মোট ভূখন্ডের অন্তত শককরা ২৫ ভাগ বনভূমি নিশ্চিত করার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়াও এ ধরণের তীব্র তাপদাহ থেকে রক্ষা পেতে কার্বন নির্গমন বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি এ ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিত থেকে উন্নতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ আমাদের সকলকে অন্তত কয়েক দশক অপেক্ষা করতেই হবে।

**তথ্যসূত্র:**


১. তাপপ্রবাহ কমানোর লক্ষ্যে আমাদের করণীয়: ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার, ভোরের কাগজ, সোমবার, ১৩ মে, ২০২৪, ৩০ বৈশাখ, ১৪৩১

২. চলমান তাপপ্রবাহের সামাজিক প্রভাব ও করণীয়: ড. মতিউর রহমান, জাগো নিউজ ২৪. প্রকাশিত: ০৯:২৬ এএম, ২১ এপ্রিল, ২০২৪

৩. তীব্র তাপপ্রবাহের কারণ ও করণীয়: মো. বজলুর রশিদ, বার্তা ২৪, প্রকাশকাল: ০৬ জুন, ২০২৩, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

৪. আবহাওয়া কেন চরমভাবাপন্ন হলো: ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক, প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ২২ এপ্রিল ২০২৪ ১৬:০৪ পিএম

৫. তীব্র তাপপ্রবাহ ও বৈশ্বিক অবিচার: সুস্মিতা শ্যামা, সময়ের আলো, বুধবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৪, ১:১৮ এ এম



প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর: অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# অন্নদামঙ্গল কাব্যে মেহেরপুরের গ্রাম-জনপদ

মুহ. আনসার উল-হক

মেহেরপুর জেলার রসিকপুর গ্রামের বাসুদের বিশ্বাস ও তাঁর কন্যা বেবি দাবি করেন তাঁদের পূর্বপুরুষ ঈশ্বরী পাটুনী হলেন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিখ্যাত ঈশ্বরী পাটুনী। বাসুদেব ও বেবি বললেন মাঝি দেবীকে ঘাট পার করে দেবার পর দেবী বর চাইতে বলেছিলেন। কবির ভাষয় আমরা যেমন, জানি:

'বর চাহ মনোনীত যাহা চাহ দিব।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
তথাস্ত বলিয়া দেবী দিল বর দান।
দুধে ভাতে থাবিবেক তোমার সন্তান।'

বেবি ও তাঁর বাবা বেশ গর্বের সাথেই বলছিলেন যে, তাদের পূর্বপুরুষ বেশি লোভ করে সোনাদানা, বিত্ত বৈভব চাইনি। দেবীর দর্শন কৃপাই ছিল তাঁর কাছে বড় পুণ্য লাভ। তাই কেবল দুধ ভাত চেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে চেয়েছিলেন তারা। আজ তাদের সে আবস্থা নেই। তাদের ধারণা; থাকবে কী করে ধর্ম কর্ম কী তারা করেন? তবুও দেখলাম দেবীর প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের আকুতি। তাদের বড় দুঃখ তাঁরা দেবীর অবতরণ ও অধিষ্ঠানের স্থানটি রক্ষা করতে পারেননি বলেই তাদের কপাল পুড়েছে। আগেকার মতো মাসব্যাপী পুজো অর্চনা করার ক্ষমতা ও সাধ্য তাদের নেই। তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন এ তল্লাটে আর নেই। তাছাড়া আজকাল সবাই যেন ধর্মে-কর্মে দেব দেবীর কথা ভুলতে বসেছে বলে তাদের আক্ষেপ। বাসুদেব ও বেবির সাথে আমার পরিচয় একটি আকস্মিক ঘটনা। আমার মনে হয় বাংলাদেশের সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত এক বিস্ময়কর তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে এর মাঝে। তাদের সাথে পরিচয়ের বাতাবরণের খবর কিছুটা বলি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ইতিহাস, ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যাক্তিত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। ভৌগোলিক ও স্থানিক পরিচয় সম্পর্ক ব্যাপারে নানা প্রশ্ন ও মতামত দেখা যাই। কাব্যে বর্ণিত মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ এবং তার ইতিহাস ব্যাপারে দেখা যাই ব্যাপক আলোচনা। 'আকবর নামা', 'ইকবল নামাই', 'জাহাঙ্গীরা, তুজক-ই জাহাঙ্গীরী' কোথাও এ যুদ্ধের দিশা নাই। আবার 'যশোর ও খুলনার ইতিহাস' এ সতীশ মিত্র মহাশয় প্রতাপ মানসিংহের যুদ্ধের কথা বলেছেন। মীর্জা নাথানের 'বাহারস্তানই গায়েবী' গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের কথা বলা সেটা মানসিংহের সাথে নয়, ইসলাম খানের সাথে এ যুদ্ধে মির্জা নাথান নিজেও অংশগ্রহণ কারেছিলেন। ইতিহাস আলোচনার ব্যাপারে দেখা গেছে প্রকৃত ঘটনা খুঁজতে চেষ্টা করা হয়েছে বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে অথবা কবির বর্ণনা বা ইতিহাসকে ভিন্ন মতবাদ বা দর্শনের চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে মিথ্যা তথ্যের গহবরে পড়তে হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাসের আলোকে ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক তথ্য জানার চেষ্টা এবং সেই প্রেক্ষাপটে ভারতচন্দ্রের বিচারের প্রচেষ্টা এ যাবত করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। ভারতচন্দ্রে প্রতাপ-মানসিংহ যুদ্ধ, মানসিংহের সৈন্য ঝড় বৃষ্টি, ভারতচন্দ্রের রঙ্গরসিকতা ও রুচির প্রশ্ন, ভবানন্দ মজুমদার পরিচিতি প্রসঙ্গে নানাবিধ আলাপ আলোচনা আছে। ইতিহাস প্রসঙ্গে জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই মানসিংহ অংশে মন্তব্য করেছেন,

"ভারতচন্দ্র ঐতিহাসিক নহেন, তিনি কবি। সুতরাং ইতিহাসের শুষ্ক সত্য তাঁহার কাব্যের উপজীব্য বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না, সে কথা মানি,... তবে ইতিহাস বিদিত ইসলাম খাঁর হাতে প্রতাপের পরাজয় ও মৃত্যুকে মানসিংহের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া শুধু অনৈতিহাসিকতারই সৃষ্টি করেন নাই অধিকন্তু মনে হয় তিনি যেন পণ্ডিতজন সমাজে তাঁহার কাব্যের রসভঙ্গই করিয়াছেন।"

প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিচারে ঐতিহাসিকতা অক্ষুণ্ন রেখে সাহিত্যরস সৃষ্টির বিষয়টি আধুনিক যুগের সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে বিচার করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সে প্রসঙ্গ এ আলোচনায় আনছি না, - সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

প্রতাপের পরাজয় ও মৃত্যুকে মানসিংহের ঘাড়ে চাপিয়ে কবি ইতহাস বিকৃত করে কাব্যরস ভঙ্গ করেছেন বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সব মঙ্গল কাব্যই ধর্ম বা দেবনির্ভর। অন্নদামঙ্গলকেও সে গোত্র থেকে আলাদা করা হবে না, জানি। তবে ইতিহাস, ইতিহাসের ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থান কাল এবং সামাজিক মানুষকে তাঁর কাব্যে বিশেষ স্থান দেবার মানসেই তো কৃষ্ণনগরের মহারাজার আজ্ঞাবহন করেছিলেন কবি। কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ এবং বাগোয়ান তথা কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের গুণকীর্তন এবং সংশ্লিষ্ট কাহিনি ও ঘটনার বর্ণনার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের রীতি মেনে দেবী অন্নদার কাহিনি বর্ণনা ও পূজা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ্য সৃষ্টি করতে হয় কবিকে।

'আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।'

মহারাজা শুধু আজ্ঞাই দেননি পূর্বপুরুষের গুণকীর্তনসহ মঙ্গলগান রচনার কথাও বলেছিলেন।

'কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেই মত রচিয়া বিধানে।'

ফরমায়েসি রচনা যে এত গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত হয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতচন্দ্র ইতিহাসের ব্যক্তি, ঘটনা ও মানুষকে দেবনির্ভর কাব্যে স্থান দিতে গিয়ে ঘটনা ও চরিত্রের ওলটপালট ঘটিয়ে একটার ঘাড়ে আর একটা চাপিয়ে এক বিশেষ স্টাইলের প্রবর্তন করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের এই বিশেষ স্টাইলটি এ যাবত আলোচনায় না আসার ফলে অনেক বিষয়ই সুমিমাংসিত হতে পারেনি। শুধু প্রতাপ-মানসিংহ যুদ্ধই নয় আরও কিছু ঘটনা ও ব্যক্তির পরিচিতি নিয়েও প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে এবং এ যাবত এসবের সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। তার কারণ মনে হয় কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর এলাকার আঞ্চলিক ইতহাস ও সমসাময়িক আঞ্চলিক সমাজ জীবনের প্রতি গবেষক সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া অথবা ইতিহাস ও সমাজ সত্যকে গবেষণামূলক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে মতবাদী ও দার্শনিকতার পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাসের সত্য নিরূপনের প্রচেষ্টা। আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঘটনার দু একটি কথা এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা যায়। কাব্যের 'মানসিংহের সৈন্য ঝড় বৃষ্টি' অংশে মানসিংহের ভবানন্দের বাড়ি বাগোয়ান যাওয়া উপলক্ষে 'মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুমদারে কোথায় তোমার ঘর' দেখাও আমারে। মজুমদার কহিল সে দূর বাগোয়ান। মানসিংহ কহে চল দেখিব সেই স্থান। বাগোয়ান পৌঁছতে গিয়ে নদী পথে ঝড় জলে মানসিংহ এবং তার লোকলস্কর আক্রান্ত হলেন। ফেলিয়া বন্দুক জামা, পাগড়ি, তলোবার, ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার। খাবি খায় মরে লোক হাজার হাজার। তল গেল মালমত্তা উরুদু বাজার। ইতিহাসের মানসিংহের এরূপ দুর্যোগে পতিত হওয়া ঘটনার কথা জানা যায় না। তবে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত গ্যারেটের 'নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' থেকে শুরু করে কুষ্টিয়া জেলার গেজেটিয়ারের সব গ্রন্থ একটি ঘটনার কাহিনি জানা যাই। ঘটনাটা কবির জীবদ্দশাতেই ঘটেছিলো মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দী বাগোয়ানে মৃগয়া করতে এসে ভৈরব নদী মেহেরপুরের সন্নিকটে রাজাপুর গ্রামের পাশে ঝড় জলে আক্রান্ত হয়ে নাস্তানাবুদ হন। রাজু গোয়ালিনী নাম্নি একজন ধনাঢ্য বিধবা মহিলা রাজার লোকজনকে শুকনো কাপড় চোপড় ও আশ্রয় দান করেন এবং চিড়া-গুড় দিয়া আপ্যায়ন করে রাজঅনুগত্য এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। নবাব আলীবর্দী খুশি হয়ে রাজু গোয়ালিনির ছেলেকে রাজা গোয়ালা উপাধি দান করে অত্র এলাকার দায়িত্ব ভার দান করেন। ভারতচন্দ্র আলীবর্দীর ঝড়-জলে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি মানসিংহের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রঙ্গরস ও ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ নিয়ে সমালোচোকরা ভারতচন্দ্রের বিশেষ নাগরিক রুচির কথা সম্পর্কে নানান আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বোধহয় একটি কথা বেশি করে মনে রাখা দরকার যে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের খ্যাতিমান সভাকবি ছিলেন। আর গোপাল ভাঁড় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারের খ্যাতিমান হাস্যরসিক, বিদূষক। রাজা তার সভাসদ ও তৎকালীন নাগরিক সমাজ গোপাল ভাঁড়ের রঙ্গরসের সিক্ত হয়ে তাকে ধন্য ধন্য করতেন। আসলে ভারতচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে গোপাল ভাঁড়ের কাব্য রুচির পৃষ্ঠপোষকতা করতে চেয়েছেন। ভবানন্দের পরিচিতি কাব্যে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আলোচকরা যে ইতিহাস সম্পর্কে দ্বিধা বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছেন আমার মনে হয় শ.ম. শওকত সাহেবের 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস' গ্রন্থের তথ্য গ্রহণ করলেই আসল বিষয় জানতে সুবিধা হয়। অর্থাৎ ভবানন্দের পূর্বপুরুষ আকস্মিকভাবে নদীয়াই আসেননি। সমাদ্দার বংশের লোকজন পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন এবং যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের এলাকায় কর্মরত ছিলেন। প্রতাপ পরিবারের গৃহবিবাদ কালে বসন্ত রায় নিহত হলে তারা বাগোয়ান এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে বসবাস শুরু করেন। রাজা প্রতিপাদ্যতের ব্যাপারে তাদের জানাশোনা ছিল প্রচুর। সেই সুবাদে বাগোয়ান নৌঘাঁটি থেকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধে মির্জা নাথান বা মোঘলদের সাহায্য করেছিলেন যার পুরস্কার স্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার বাগোয়ান পরগণা লাভ করেন। ভারতচন্দ্রে সেটি মানসিংহের নামে চাপিয়ে বর্ণনা করেন– 'আগে পাশে দুই সারি লস্কর চলিলেন মানসিংহের যশোর নগর। মজুমদারের সাথে নিলা ঘোড়া চরাইয়া। কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া।' অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিধৃত ইতিহাস সমাজ ঘটনায় ও ব্যক্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী একটির বদলে অন্যটি বর্ণনা করে ভারতচন্দ্র বিশেষ স্টাইল বা ভঙ্গিমার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক সমালোচকদের স্থানীয় আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঘটনার প্রতি আগ্রহ না দেখানোর ফলে তা আমাদের বোধগাম্য হয়ে উঠেনি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা কাব্যরস ভঙ্গ হয়েছে বলি বা ইতিহাসের উপাদানের উৎস খুঁজে পাইনি বলে কবির প্রতি অবিচার করি। একটি ঘটনার ঘাড়ে আর একটি ঘটনা চাপিয়ে দিয়ে যে বিশেষ স্টাইল সৃষ্টি করেছিলেন ভারতচন্দ্র তা আধুনিক পাঠক সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে দুর্বোধ্য ও রসহীন হয়েছে বলে অনেক ক্ষেত্রে মনে হলেও তৎকালীন পাঠক বা দর্শকদের বুঝতে বা রসগ্রহণ করতে অসুবিধা হতো না। কারণ তারা সব ব্যক্তি পরিচিতি বা ঘটনার ওলট পালট ব্যাপারে অবহিত ছিলেন এবং এতে ভিন্নধর্মী একটি স্বাদও গ্রহণ করতেন। কৃষ্ণনগরের রাজদেউড়িতে যখন এই পাঞ্চালি প্রথম মঞ্চে উপস্থাপন করানো হয় তখনকার শ্রোতা দর্শক কবির

প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। নীলমণি ছিলেন রাজদেউড়িতে প্রথম গায়েন।

'ডিউসাই নীলমণি কণ্ঠে অভরণ।/এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়েন।'

একটি ঘটনা ও ইতিহাসের ঘাড়ে অন্যাটি চাপানো, স্থানিক, ভৌগোলিক বিষয়াদির বর্ণনা ও কল্পনার এই ধরনের স্টাইল বা ঢং প্রদর্শনের বিষয়টি আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করে এবং আমার কেন জানি বারবার মনে হতো ভারতচন্দ্র যে ঘাটের কথা কল্পনা করেছিলেন–

'অন্নপূর্ণা উত্তররিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পটুনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।'

এই ঘাটটি বাগোয়ান-ভবানন্দপুর ঘাট। রসিকপুর ঘাটও বলা হয়। বাগোয়ান থেকে কৃষ্ণনগরের গোয়াড়িতে রাজধানী স্থাপনের আগে ভৈরবের উত্তর প্রান্তে ভবানন্দ মজুমদারের নাম অনুসারে ভবানন্দপুরে রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন এটি ভাবানন্দপুর কাছারিবাড়ি নামে পরিচিত। সভাকবি ভারতচন্দ্র বহুবার এই ঘাট পার হয়ে প্রাচীন রাজধানী বাগোয়ান ও ভবনন্দপুর এসেছেন। রসিকপুর গ্রামটি রসিকরাজ গোপাল ভাঁড়ের স্মৃতি বহন করে কিনা জানিনা। কবি এই ঘাটটির কথা মনে রেখেই কল্পনা করেছিলেন হরিহোড়ের গৃহ ছেড়ে ঘাট পার হয়ে ভবানন্দপুরের ভবানন্দ মন্দিরে দেবীর অধিষ্ঠানের কথা। এ ঘাট সম্পর্কে আমি এ রকমই ভাবতাম। তাছাড়া বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলির অন্যতম হিসেবেও এই ঘাটটির খ্যাতি আছে ইতিহাসে। কবির কল্পনায় এই ঘাটের চিত্র থাকুক বা না থাকুক এর ইতিহাস প্রসিদ্ধতা ও ঐতিহ্যের কারণে এলাকাটি বিশেষভাবে দেখার ইচ্ছে ছিল বহুদিনের। কিছুদিন আগে আমি এই ঘাট ও তৎসংগ্ন ঐতিহাসিক এলাকাগুলি দেখতে যাই বিশেষ কৌতূহল নিয়ে। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ থেকে তিন-চার কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর কোণে এই ঘাটটির অবস্থান। শুষ্কপ্রায় মরা ভৈরব নদী। ঘাটের দক্ষিণ পাশের বল্লভপুর-রতনপুর পাকা সড়কের পাশ থেকে ঘাটের দিকে নামছি। ঘাটের রাস্তায় এবড়ো থেবড়ো মাটির গর্ত ও ছোট ঝোপঝাড়ে ভরা। লোকজন তেমন চলাচল করে না বলেই মনে হল। যাচ্ছিলাম রিক্সাতে, রিক্সা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। নদীতে নৌকা পারাপার নেই। বাঁশের ফরাস পাতা। ফরাসের উপর দিয়ে খালি রিকশা ও আমি হেঁটে হেঁটে পার হচ্ছি। ফরাসের পাশে কচুরিপানা ভর্তি সামান্য পানির রেখায় শুকনো মরানদী। মাছ ধরার একটা ছোট একটা ডিঙি নৌকাও দেখলাম পশ্চিম দিকে। কচুরিপানার ফাঁকে একটু আধটু পরিষ্কার সামান্য পানিতে স্নানরত ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝিদের দেখলাম। দক্ষিণ পাশ অর্থাৎ বাগোয়ানের দিক থেকে উত্তরে রসিকপুর ও ভবানন্দপুরের দিকে যাচ্ছি। নদীর দুকূলের ভীষণ উঁচু পাড়ে এক কালের গহীন গভীর নদী-খাতের চিহ্ন ধারণ করে আছে। কৌতূহল ও আবেগ বিস্ময়ভরা মন নিয়ে চারপাশ দেখছি আর ফরাসের উপর হেঁটে হেঁটে নদী পার হচ্ছি। ইতিহাসের স্মৃতি মনকে বড়ই উদ্বেল করে তুলছে। এই ঘাটটি ছিল মোঘলদের নৌঘাটি। 'বাহারস্তান-ই গায়েবি' গ্রন্থের লেখক মোঘল নৌসেনা মীর্জা নাথান কিছুদিন কাটিয়েছিলেন এই ঘাঁটিতে এবং এখানে তার বিয়ের উৎসব পালিত হয়। আশপাশ এলাকার মৃগয়াও করেছেন। এই নৌঘাঁটি থেকেই মীর্জা নাথান সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে। এইসব এলাকাতেই এসেছিলেন নবাব আলীবর্দী মৃগয়ায় এবং পথে ঝড়-জলে আক্রান্ত হন। রেনেলের মানচিত্রে বাগোয়ান পরগণা পরিচয়ে এই ঘাটটিকেই চিহ্নিত করা আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে দরবেশ সেনাপতি খান জাহান আলী তাঁর নৌবহর নিয়ে ভৈরব নদী অতিক্রম করেন। নদীর দুপাশের বিজিত এলাকার ধর্ম প্রচারের জন্য বাগোয়ানে নামিয়ে দেন দরবেশ শাহ ফরিদকে। বাগোয়ানে শাহ ফরিদের দরগার ধ্বংসাবশেষ ও মসজিদ এখনও বিদ্যমান। সেনাপতি খান জাহানের যুদ্ধ নৌবহরের পিছনেই থাকতো দরবেশ ও ধর্মপ্রচারক ওলিদের নৌকা। তাঁদেরই নামিয়ে দেন পথিমধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য। মেহেরপুর এর নিকট দরবেশ মেহেরউল্লাহ যার নাম অনুসারে এখন মেহেরপুর জেলা সদর, বারো বাজারে বারো জন আওলিয়া, যশোরে গরিব শাহ কসবা বা নগর স্থাপন করেন। বিজয় ও ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করে শেষে তিনি পৌঁছান হাবিলী কসবা বা প্রধান শহর বাগেরহাটে। পরগণা বাগোয়ানের এই ঘাটের প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিগুলো কেবল আমার মানসপটে ভেসে উঠছে আর তার সাথে আমার নিজের ধারণা কল্পনার কথা মনে হচ্ছে- এই ঘাটকেই কবি ভারতচন্দ্র দেবী পারের ঘাট বলেই কল্পনা করেছিলেন। ওপারেই ভবানন্দপুর। এখানেই দেবীর যাত্রা। যতই দেখছি কবি ঠিক এ ঘাটের কথাই কল্পনা করেছিলেন বলে আমার ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতির দৃশ্য অবলোকন ও কবি কল্পনায় স্মৃতিচারণে আলোড়িত হতে হতে উঠছি-উপরের দিকে। রাস্তার পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তি বয়স ষাট পয়ষট্টি হবে, দোহারা গঠন চেহারাটা বেশ দেখতে। ঘাটপারের পারানি চাইলেন। আমি আগে ভেবেছিলাম গ্রামবাসী পারাপারের জন্য বাঁশের ফরাস পেতে সাঁকো বানিয়েছে, পয়সা, টয়সা বোধহয় লাগে না। দু পারে তেমন পারাপারের তদারকি বা পয়সা আদায়ের ব্যবস্থাদির ঘরদোর বা টোলঘর দেখলাম না। পারানির পয়সা চাওয়ার জন্য ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম-কি ব্যাপার এ ঘাটে এ ফরাস পাতার ব্যবস্থা কি আপনিই করেছেন? তিনি বললেন-হ্যাঁ বাবা নদীতে জল নাই, বর্ষার সময় ছাড়া নৌকা চলে না, লোকজনও তেমন এ ঘাটে আর পার হয় না, দারিয়াপুর ব্রিজ হওয়ায় সবাই মুজিবনগর

বাস-রাস্তায় যাতায়াত করে বেশ। নেহাত যারা আমদহ ভবানন্দপুর এলাকার যারা তারাই এ ঘাট দিয়ে যায়। গাড়ি ঘোড়া পার হতে পারে না। আমাদের চিরকালের পেশা ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনি। দেশভাগের পর আত্মীয় স্বজন সবাই চলে গিয়েছে। আমি মায়ের স্মৃতি ধরে আছি, ছুঁয়ে আছি আদি পুরুষের মাটি। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না তার কথা। মনে করলাম, মা বাবার স্মৃতি, দেশমাতার স্মৃতির কথা বলছেন। পরক্ষণে বললেন, এই ঘাটে তো আমার আদিপুরুষ দেবী অন্নদা মাকে পার করে দিয়েছিলেন। দেবী বর চেয়ে নিতে বললে শুধু দুধভাত চেয়েছিলেন অন্য কিছু না লোভ করেননি। বিস্ময়ে শিহরে উঠেছি আমি। আনেকট আড়ষ্ট হাতে পারানির পয়সা দিচ্ছি তাকে আর ভাবছিলাম যে ভারতচন্দ্রের স্টাইলটা যেখানে ছিল ঘটনার আদল বদল বা বাস্তবের চিত্র কল্পনায় এবং কল্পনাকে বাস্তব দিবার প্রচেষ্টায়। তাই এই ঘাটটিকে দেবী পারের ঘাট কল্পনা করতে পারেন সন্দেহে আমার দেখতে আসা। আমার সেই সন্দেহ অনুমানকে বাস্তবে প্রমাণে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবন্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালেন এই ভদ্রলোক। তবে কি কবি শুধু এ ঘটনাটির কথায় কল্পনা করেননি তৎকালীন জীবন থেকে নেওয়া বিশিষ্ট মাঝির কথাও বলেছেন বিস্ময় আমার সেখানেই। আমার সাথে কথা বলছেন আর পারানির পয়সা গুছিয়ে রাখছেন হাতের ঝোলাতে। এমন সময় নদীর ঘাট থেকে সদ্যস্নাত একটি মেয়ে উঠে এসে ভিজা কাপড়েই আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহল নিয়ে কথা শুনছেন আমাদের। ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন তার মেয়ে নাম বেবি। ভদ্রলোকের নাম বললেন বাসুদেব বিশ্বাস, বর্তমান বয়স বললেন পঁয়ষষ্টি। তার পিতার নাম কালীপদ বিশ্বাস, ১৮ বছর আগে ৯৫ বৎসর বয়সে মারা যান। কালীপদ বিশ্বাসের পিতার নাম সীতানাথ মাঝি, তার পিতার নাম দীনু পটুনী। সাল ক্রমধারার বর্ণনা দিতে পারলেন না। বাসুদেব বিশ্বাস একটু অন্তমুর্খী মানুষ মনে হলো। তার মেয়ে বেবির বয়স বছর ত্রিশেক বললো। এখনও বিয়ে হয়নি। বড্ডো কথা বলতে পারে। তার বাবার থেকে তিনিই শুনালেন বহু কাহিনী। তিনি সব শুনেছেন তার দিদিমার কাছে। এই ঘাটের পাশেই হাত উঠিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন। ওখানেই ছিল দেবীর অবতরণস্থল। ওখানে ছিল বিরাট বটপাকুড়ের গাছ, ওখানেই ছিল বেদী ও দেবীর আসন। প্রতিবছর চৈত্র-বৈশাখ ব্যাপী পূজা অর্চনা হতো এখন আর হয় না। বেদীতে রক্ষিত পূজার আসনটি আমাদের বাড়িতে এখনো যত্নের সাথে রেখেছি বলে। বাবা-মেয়ে আমাকে সাথে করে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বেশি দূর নয় পাশেই। পথের পূর্ব পাশের একটি বিশাল এলাকাকে দেখিয়ে বললেন, ওইসব জায়গাগুলোই ছিল আমাদের আদি পুরুষদের বাস। এখন এসব আমাদের নয়। বাড়ি বলতে বাঁশের কঞ্চির বেড়ার উপর দিয়ে কাদা লেপনের দেওয়াল ও উপরে খড়ের চালার দোচালা দুটো জীর্ণ কুটির। বড় আদর যত্ন করে পাশের বাড়ি থেকে চেয়ার এনে বসাতে চায় আমাকে। আমি নিষেধ করি। যত্ন ও আগ্রহভরে একপাশে সিঁদুর মাখানো সাদা মার্বেল-পাথরের সুন্দর একটা আসন নিয়ে এসে দেখালেন আমাকে। এটিই দেবীর আসন। বাপ বেটির চোখ ছল ছল করছে। কি যেন অব্যক্ত বেদনা তাদের।

বেলা পড়ে আসছিল। বেবিদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ভবানন্দপুর-আমদহ হয়ে মেহেরপুর ফিরে আসতে হবে আমাকে। ভবানন্দপুরের রাজবাড়ির খোঁজ করতে তার চিহ্ন বোঝা গেলা না তেমন। গ্রামের পাশে মাঠের পর মাঠ বিস্তীর্ণ এলাকায় কলাবাগান। ওই এলাকাতেই ছিল এককালের রাজবাড়ি। আশপাশ এলাকা দেখে ঐতিহ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। একটা নিচু জায়গা এক কালের কোন খালের খাত হতে পারে। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে পুবের দিকে। পথ চলতি একটি লোক বললেন, ওই খালটা পার হয়ে ভবানন্দপুর মন্দির। পড়ন্ত বেলায় প্রায়- অন্ধকার আচ্ছন্ন এক ভগ্ন মন্দিরের পাশে পৌঁছলাম। কাছে যেতেই পতপত করে উড়ে গেল বাদুড়ের দল। কদলা বৃক্ষ বেষ্টিত অন্ধকারচ্ছন্ন ভগ্ন মন্দির ও আশপাশ এলাকার বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করা যায় প্রচীন কীর্তিময় জনপদের কথা। বুঝতে অসুবিধা হয় না মহাসমারোহে এক কালের প্রাচীন রাজবাড়ির কথা। এটিই কি সেই রাজগৃহ মন্দির? এখানেই কি দেবী অন্নদা ভবানন্দ গৃহে অধিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দিরে ঝাঁপি রেখেছিলেন বলে কবি, কল্পনা করেছিলেন? অন্নদা ভক্ত ভবানন্দ বলেন:

'আপন মন্দিরে গেলা প্রেমভরে কাঁপি।
দেখেন মেঝেয় এক মনোহর ঝাঁপি।
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
হইল আকাশ বানী অন্নদা আইলা।'

অন্নদা দেবী ভবানন্দ গৃহে অধিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দিরে ঝাঁপি রেখেছিলেন। 'আপন মন্দিরে গেলা প্রেমভরে কাঁপি।/দেখে মেঝেয় এক মনোহর ঝাঁপি।' নিশ্চিহ্ন রাজবাড়ির লুপ্ত প্রায় মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে আমারও যেন মনে হচ্ছে 'পুলকে পুরির অঙ্গ ভাবিতে লাগিলাম'। বিশেষ ভাবনার বিষয় বটে। দেবী তো আর সত্যিই নদী পার হননি বা এমন ঘটনাও ঘটেনি। তবে ভবানন্দপুরের রাজবাড়ির এই মন্দিরটি তখনও ছিল, বাগোয়ান-ভবানন্দপুরের এই ঘাট সবই ছিল। ঘাটের মাঝির নাম ছিল ঈশ্বরী পাটুনী।

কৃষ্ণনগর থেকে ভবানন্দপুরে রাজবাড়ীতে যাতায়াতে কবিকে কতবার যে এই পাটুনীই পার করে দিয়েছেন তা বলা যায় না। কবি দেবী পারের ঘটনার কল্পনার সাথে জীবন থেকে নেওয়া কবির দেখা চেনা লোকটিকেও বাস্তব সত্যরূপের আড়ালে মাঝির স্বনামে কল্পনায় রূপ দিয়েছেন মাত্র। পল্লীকবি জসীমউদদীনের 'আসমানী' যেমন, কবি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরীচন্দ্রের পাটুনী

তেমনই। ইদানীং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমে আমরা আসমানীর খবর পেয়েছি। সত্যিই কবি বলেছিলেন-

আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও, রহিমুদ্দীর ছোট্টবাড়ী রসুলপুরে যাও', অনুরূপভাবে এই কথাও বোধ হয় বলা যায়, 'ভারতচন্দ্রের পাটুনীরে চিনতে যদি চাও, বাসুদেবের ছোট্টবাড়ী রসিকপুরে যাও'। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর নাম তাঁর মঙ্গল পাঞ্চালীতে ব্যাবহার করার ফলে পাটুনীও পরিচিত হয়ে ওঠেন সবার মাঝে। তৎকালে পাঞ্চালী দর্শক-শ্রোতারা অনেকেই তাকে চিনতেন জানতেন। পুণ্যকাজের ভূমিকায় তার স্বনামে কারো স্থান পাওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করে কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা তো বটেই দেবীর প্রতি মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য পূজা আর্চনার ব্যাবস্থাও করেছিলেন ঈশ্বরী পাটুনী ও তার বংশধরগণ। বাসুদেব ও বেবি সেই সুবাদেই এখন দাবি করেন তাঁদের পূর্বপুরুষ দেবী পার করে সন্তানের দুধে ভাতে থাকার বর প্রার্থনা করেছিলেন। আমি নিজ লেখক, পণ্ডিত বা গবেষক নই। অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঘটনা, ইতিহাস স্থান বর্ণনার আদল বদল করার এক বিশেষ স্টাইল কবির মধ্যে লক্ষ করে কৌতূহলবশত কল্পনার দেবী পারের ঘাটটি খুঁজতে যাওয়া। আকস্মিকভাবে বাসুদেব পরিবারের সাথে দেখা। এটা নিশ্চিত যে বাসুদেব পরিবার তার পূর্বপুরুষের কথা যা বলছে সেটা তাদের সরল সত্যকথন। বাংলাদেশের সমাজ ও শ্রেণিপেশার মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের ধারায় বাসুদেব পরিবার সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের নিকট একটি বড় উদাহরণ হিসেবে অন্বেষার পাত্র হতে পারে। আর সমসাময়িক সমাজজীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে একটি লোকের নাম উচ্চারণ করে মঙ্গলকাব্যের কবি ভারতচন্দ্র যে মানবমুখিতার পরিচয় দিয়েছেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তা অনন্যতার দাবি রাখে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিগণ মানব মানবীর জাগতিক প্রেমের আড়ালে ভক্ত ও ভগবান, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, সৃষ্টি ও স্রষ্টা বা রাধা কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। বৈষ্ণব কবিতার মুখ্য বিষয় ধর্ম হলেও লক্ষ করলে, দেখা যাবে মানুষও গৌণ নয়। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিকে সম্বোধন করেছিলেন-

চুরি করি লইয়াছ কার মুখ স্মরি/ এই প্রেমে প্রীতিহার/ গাঁথা হয় নর নারী মিলন মেলায়/ কেহ দেয় তারে দেবতারে,/ কেহ বধূর গলায়/আর পাবি কোথায়/ দেবতারে প্রিয় করি/ প্রিয়রে দেবতা।' বৈষ্ণব কবিদের ধর্মতত্ত্বের মধ্যের মানবমুখিতার চরম উৎকর্ষের সত্য লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতচন্দ্রের মাঝে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন শিল্প কুশলতা ও আদি কারিগরের বৈশিষ্ট্য। ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, "রাজসভা কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি ও শিল্প সৃষ্টির বৈদগ্ধে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ওই মন্তব্য করেছিলেন। বাগোয়ান-রসিকপুর নিবাসী ঈশ্বরী পাটুনীর ব্যক্তিক পরিচিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তেমন তথ্য ছিল না। থাকলে কবি ভারতচন্দ্রের সমাজ সচেনতা সম্পর্কে কিছু বলতেন নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে আমরা দেখতে পাই পদ্মা নদীতে বোটে বসেই সন্ধান পেয়েছিলেন 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীর, 'ছুটি' গল্পের ফটিকের। নদীতীরে গাছের গুড়ি নিয়ে খেলতে থাকা ছেলেদের মাঝে ফটিককে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সম্পর্কের চিত্র। ভারতচন্দ্র ঈশ্বরী পাটুনীর সন্তানের দুধে ভাতে থাকার প্রার্থনার মাঝে দেখেছিলেন তৎকালীন সামন্ত রাজা ও বর্গীদের অত্যাচারপীড়িত সাধারণ মানুষের আশা ভরসার স্বরূপ। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর সন্তানের দুধে ভাতে থাকার বর প্রার্থনার ঘটনাকে আশ্রয় করে তৎকালীন নিপীড়িত শোষণক্লিষ্ট শ্রেণি যেন কথা কয়ে উঠতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পদ্মার বুকে নৌকা থেকে মৃন্ময়ীরূপী এক বালিকাকে দেখে সৃষ্টি করেছিলেন আধুনিক ছোটগল্প। ভারতচন্দ্র ভৈরব নদীর বুকে ঘাট পারাপারের মাঝির প্রার্থনার মাধ্যমে বাংলার সমাজমানসের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে দেখতে পেয়েছিলেন, যা বললে অত্যুক্তি হবে না।

মুহ. আনসার উল-হক: অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও ভূতপূর্ব শিক্ষক, বাংলা
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# দীনেন্দ্রকুমার রায় : এক বিস্মৃতপ্রায় লেখক

আবদুল্লাহ আল-আমিন

'বাংলা ১৩১১ সনে, প্রকাশিত হয়েছিল ছোট একটি বই, বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল পরম শ্রদ্ধাভাজন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, শ্রীকরকমলেষু। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আট বছরের ছোট এই সাহিত্যসেবীর নাম দীনেন্দ্রকুমার রায়।'[১] বইটির নাম পল্লীচিত্র, এটি প্রকাশিত হয় কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের রায় এন্ড রায় চৌধুরী প্রকাশনী থেকে, কিন্তু ভূমিকার উপান্তে লেখকের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছিল মেহেরপুর, নদীয়া। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৬৯-১৯৪৩) নামের সাথে যারা পরিচিত, তারা তাঁকে *বন্দিনী রাজনন্দিনী* কিংবা *অজয় সিংহের কুঠি*'র মতো ডিটেকটিভ সিরিজের রচয়িতা কিংবা গোয়েন্দা কাহিনি মিস্টার ব্লেকের স্রষ্টা হিসেবেই চেনেন। ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেক এককালে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে, রবার্ট ব্লেক রহস্য সিরিজের ভাষা, কাহিনি, পরিকল্পনা, শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা পরম্পরা, উৎকণ্ঠা-বিস্তার এতটাই মর্মভেদী ও মনকাড়া ছিল যে দীনেন্দ্রকুমার রায় রহস্যরস পিপাসু পাঠকসমাজ এমনকি অনুসন্ধিৎসু সমালোচকদের কাছে গৃহীত ও আদৃত হন রহস্যকাহিনির রচয়িতা হিসেবে। কিন্তু এটা তাঁর আসল পরিচয় নয়, এটা তাঁর অপেক্ষাকৃত গৌণ পরিচয়-চিহ্ন। তিনি ছিলেন দিগন্তবিস্তারী প্রতিভাসম্পন্ন বহুপ্রসূ গদ্যশিল্পী, প্রাবন্ধিক ও সংবাদপত্রসেবী। পল্লিবিষয়ক মননশীল রচনার জন্য তিনি 'রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ পাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন'। দীনেন্দ্রকুমারের *পল্লীচিত্র* অনেক বছর ধরে (পশ্চিমবঙ্গের) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শেখবার আদর্শ পুস্তকগুলির অন্যতম ছিল। প্রকাশক ও মুদ্রক হিসেবে প্রকাশনাশিল্পের সমৃদ্ধি ও বিস্তারে জীবনের একটি বড়ো সময় অতিবাহিত করেছেন তিনি। 'পাঁচকড়ি দের অনুসরণে দীনেন্দ্রকুমারও বসিয়েছিলেন নিজস্ব ছাপাখানা। তাঁর রহস্য-লহরী সিরিজের ১০৮-নং বই বন্দিনী রাজনন্দিনী ছাপা হয় তাঁরই নিজস্ব ছাপাখানায়, যার ঠিকানা ছিল ২-এ অক্রুর দত্ত লেন, কলকাতা। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পুত্র দিব্যেন্দ্রকুমার রায়।'[২] বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এই লেখক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার জন্য রবীন্দ্র-ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী, রজনীকান্ত সেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, জলধর সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ সাহিত্যসেবীর নিবিড় স্নেহসান্নিধ্য লাভ করেন। ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত 'প্রথম আলো' উপন্যাসে কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ব্যক্তিজীবনের একটি বিশেষ দিক। তিনি লিখেছেন,

'দীনেন্দ্রকুমার রায় এক দরিদ্র বাঙালি লেখক, কলকাতার কল-কোলাহল ও সাহিত্য পরিবেশ ছেড়ে এই নিস্তরঙ্গ বরোদায় এসে পড়ে থাকার কোনও বাসনা তার ছিল না। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। বাংলা গল্প-প্রবন্ধাদি লিখে পয়সা পাওয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়ে গৃহশিক্ষকতার কাজ নিতে হয়েছে। এমন ছাত্র পাওয়ায়ও অবশ্য ভাগ্যের কথা। ছাত্রটি মাস্টারের থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং স্বয়ং একজন অধ্যাপক। বরোদা রাজ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে এর মধ্যেই অরবিন্দর বেশ নাম ছড়িয়েছে। ছাত্র হিসেবে অরবিন্দ যে শুধু মনোযোগী তা-ই নয়, অতি খুঁতখুঁতে। বাংলা তার মাতৃভাষা হলেও শৈশব থেকেই মাতৃসঙ্গ বঞ্চিত, এই ভাষাতে সে কথা বলতেও পারে না। কিন্তু এখন সে উত্তমরূপে বাংলা শেখার জন্য বদ্ধপরিকর। একখানি বাংলা বই ধরে ধরে সে প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে নিতে চায়।[৩]

প্রথম আলো উপন্যাসে এভাবেই অরবিন্দের গৃহশিক্ষক, সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই বিশাল উপন্যাসে তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতা বোঝাবার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম-আন্দোলন, পেশাদারি থিয়েটার মঞ্চে গিরিশ ঘোষ-নটী বিনোদিনীর অবদান, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের নানা রূপান্তরের কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি টেনে এনেছেন খ্যাতিমান লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রসঙ্গ। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দের মতো দীনেন্দ্রকুমারও এ উপন্যাসে একটি জীবন্ত চরিত্র। কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পাদক, ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রণেতা ও অনুবাদক হিসেবে তৎকালীন বাঙালি বিদ্বৎসমাজে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রভাব-পরিচিতি-গ্রহণযোগ্যতা যেমন ছিল, তেমনি জনপ্রিয়তাও ছিল উল্লেখ করার মতো। কিন্তু একালে তিনি প্রায় বিস্মৃত একটি নাম। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে তাঁর পরিচিতি নেই বললেই চলে। অথচ দীনেন্দ্রকুমারের *পল্লীচিত্র* পড়ে অভিভূত হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'ইহা আমাদের এই তরুপল্লব মর্ম্মরিত ছায়াময় বাংলাদেশের হৃদয়ের মধ্য হইতে আনন্দ ও শান্তি বহন করিয়া আনিয়া আমাকে উপহার দিয়াছে।'[৪]

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জলধর সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সহ সেকালের প্রথিতযশা সাহিত্য-ব্যক্তিত্বরা বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৎকালীন যুগের সমাজের, সাহিত্যের, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সুষ্ঠু-মনোরঞ্জনের অক্লান্ত কর্মী ছিলেন দীনেন্দ্রকুমার। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁকে 'বঙ্গভূমির সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর চিত্র-উপাসক' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, 'বাঙ্গালার পল্লীশ্রীর অনেক চিত্র ও পল্লীবাসীর বিবিধ সুখ দুঃখের বহুকাহিনি এই ভাবুক ভক্তের ঐন্দ্রজালিক তুলিকার স্পর্শে সমুদ্ভাসিত ও সাহিত্যভাণ্ডারের চিরন্তন সম্পদে পরিণত হইয়াছে।'[৫]

## দুই

বাংলার সামাজিক ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, ইংরেজরা আসার আগে বাংলার গ্রামগুলি ছিল বেশ সচ্ছল ও স্বনির্ভর। তখন গ্রামে গ্রামে যেমন সুখ-শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তেমনি ছিল মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি-সহবত। বছর জুড়ে গ্রামে গ্রামে চলত নানা ধরনের পাল-পার্বণ-নৃত্য-গীত, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব। ' গ্রামে নিজ নিজ ক্ষেতে উপযুক্ত চাষ হত। ধেনু দ্বারা গৃহ ছিল পবিত্র। গৃহকর্তা ছিল অতিথিবৎসল। গৃহিণীদের ছিল না অতিথিসেবায় ক্লান্তি। চণ্ডীমণ্ডপে বসত আসর, আঙিনায় চলতো রামায়ণ পাঠ, চলতো কথকতা।'[৬] বাড়ি বাড়ি উৎসব যেন লেগেই থাকত। বিভিন্ন গ্রামে ছিল যাত্রার দল, কবিগানের দল, জারিগানের দল, অষ্টক গানের দল। উৎসব, পাল-পার্বণে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন স্থানীয় জমিদার ও গ্রামীণ এলিটরা। দুর্গোৎসব ও কালীপূজায় বারোয়ারিতলায় বসত কবিগান ও যাত্রার আসর। মহরম উপলক্ষে হত জারিগান, লাঠিখেলা এবং মেলা। প্রায় গ্রামেই ছিল সৌখিন যাত্রাদল। জমিদারবাড়িতে যাত্রা কিংবা পালাগানের মহড়া বসত। রামায়ণ গান ও পদাবলী কীর্তনের প্রতি মুসলমান চাষিদেরও আগ্রহ ছিল। জ্যোৎস্না রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে গ্রামের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সারারাত ধরে পালাগান শুনত। গান শুনেই তারা শিখত ধর্ম ও জীবনের কথা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিষাক্ত নিশ্বাসে পুড়ে ছাই হতে থাকে বাংলাদেশের 'শাশ্বত গ্রাম'-এর সেই সৌন্দর্য-সুষমা। ভেঙে পড়ে তার চিরায়ত সমাজ কাঠামো, সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও শিক্ষাব্যবস্থা, বংশগত বৃত্তি হারিয়ে মানুষ অভাব-আকাল, মূল্যবোধজনিত অবক্ষয়সহ নানা অসঙ্গতির মুখোমুখি হয়। সেইসঙ্গে নগরায়ণের চোখ ধাঁধাঁনো আলোয় গ্রামের মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যন্ত্রদানব ও শিল্পায়নের উদ্ধত পদাঘাতে তছনছ হয় গ্রামের মানুষের জীবনচর্যা, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন ও বিশ্বাস-মূল্যবোধ। নাগরিক জীবনের আলো-আঁধারিতে প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ পিঁপড়ের মতো শহরে এসে ভিড় জমাতে থাকে। সর্বস্ব খুইয়ে করুণ স্মৃতি নিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে থাকে বাংলার হাজারো গ্রাম। দীনেন্দ্রকুমার রায় অত্যন্ত দরদ দিয়ে সেইসব বেদনাপীড়িত গ্রাম ও গ্রামজীবনের করুণ স্মৃতি তথা সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, উৎসব-উদযাপনের রূপপ্রতিমা অংকন করেছেন তার পল্লিবিষয়ক নানা গ্রন্থে। দীনেন্দ্রকুমারকৃত '*পল্লীচিত্র*', '*পল্লী বৈচিত্র্য*', '*পল্লীকথা*', '*পল্লীবধূ*' প্রভৃতি গ্রন্থ মূলত চিরায়ত বাংলার রূপপ্রতিমার আবেগঘন বর্ণনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইংরেজ শাসনে বিপর্যস্ত বাঙালি জাতি তার হৃত গৌরব ফিরে পেতে এক ধরনের আবেগ ও অন্তর্গত তাগিদ অনুভব করছিল, সেই আবেগ ও তাগিদ থেকেই আমরা ফিরে পেতে চেয়েছিলাম পিতামহ-প্রপিতামহের স্নেহছায়া বিজড়িত উদ্বেগহীন পল্লীজীবন, পল্লীকে জানা ও জানাবার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছিল তখন। দীনেন্দ্রকুমারের পল্লিবিষয়ক রচনাগুলিও ভেতরের তাগিদ ও শিকড়ের কাছে ফিরে যাবার আকুতি ও আবেগ থেকে রচিত। পল্লিবিষয়ক রচনার পাশাপাশি *সেকালের স্মৃতি*-ও একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এই অনবদ্য স্মৃতি আলেখ্যে খুঁজে পাওয়া যায় ঊনিশ শতক থেকে বিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত কালখণ্ডের অবিভক্ত বাংলা ও বাঙালির যাপিত জীবনের জলছবি। ফলত এটি কেবল তাঁর ব্যক্তিজীবনের স্মৃতি আলেখ্য না-হয়ে, হয়ে উঠেছে বঙ্গীয় জনজীবনের সামাজিক ইতিবৃত্ত।

## তিন.

দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম ২৬ আগস্ট ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট অবিভক্ত নদীয়া জেলার মেহেরপুরের এক সম্ভ্রান্ত তিলি বংশে। তাঁর পিতা ব্রজনাথ রায় ছিলেন সাহিত্যসেবী, পেশাগত সূত্রে কৃষ্ণনগরে বসবাস করতেন। কর্মসূত্রে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে কৃষ্ণনগরের উচ্চশিক্ষিত অভিজাতদের সান্নিধ্য লাভ করেন। 'তাঁর কৃষ্ণনগরের বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। এমন-কী কৃষ্ণনগরে থাকার সময় ব্রজনাথ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি থেকেও বহুলাংশে মুক্ত ছিলেন, আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের দিকে।'[৭] ব্রজনাথবাবু কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজের প্রবল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এমন ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হয়েছিলেন যে এক পর্যায়ে হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও কৃত্যাচারের প্রতি আস্থাহীন হয়ে নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা শুরু করে দেন। দীনেন্দ্র-পিতা ব্রজনাথ রায় ভাল ইংরেজি জানতেন, কাজ করতেন কৃষ্ণনগরের প্রভাবশালী জমিদারি সেরেস্তায়, কিন্তু অর্থোপার্জনে তেমন সফল হননি। ফলে 'নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত' স্বীকৃতি ও দানপত্র-প্রাপ্ত রায় পরিবারের বিত্তবৈভবের জৌলুশ দীনেন্দ্রের জন্মকাল থেকেই ক্রমশ কমতে থাকে। জীবন-জীবিকার তাগিদে ব্রজনাথ ও তাঁর ভাইবর্গকে জমিদারি সেরেস্তায় অথবা রাজ-এস্টেটের চাকুরির দ্বারস্থ হতে হয়। দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম মেহেরপুরের 'সুখশান্তিপূর্ণ, ছায়াশীতল, শ্যামল বক্ষে' হলেও

শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় বাবার কর্মস্থল কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর অধ্যয়নকালে সহপাঠী ও শহরের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে পেয়ে যান অল্প-বিস্তর সাহিত্যচর্চার অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ। সাহিত্য নিয়ে মেতে ওঠেন এবং এই মেতে ওঠাটা এক পর্যায়ে এমনভাবে মাতামাতিতে পরিণত হয় যে, বাধ্য হয়ে কাকা যদুনাথ রায় তাকে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল হাইস্কুল ভর্তি করিয়ে দেন, সেখান থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দীনেন্দ্রকুমারের কাকা ছিলেন বাংলাভাষায় সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী এবং মহিষাদল রাজ-এস্টেটের কৃতবিদ্য ম্যানেজার। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণনগর ফিরে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে মহিষাদল রাজস্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। মহিষাদলে সহকর্মী হিসেবে সাহচর্য লাভ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক জলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৯)। সাহিত্যিক জলধর সেনের সাহচর্য ও স্নেহসান্নিধ্য প্রাপ্তিকে জীবনের পরম সৌভাগ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন দীনেন্দ্রকুমার তাঁর 'সেকালের স্মৃতি' গ্রন্থে। তিনি বলেন, 'সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সাহিত্য সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়া রায় বাহাদুর হইবার পূর্ব হইতে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।'[৮] কাকার বাসাতে জলধর সেন ও দীনেন্দ্রকুমার একই সঙ্গে বসবাসের দৌলতে দুজনে মেতে ওঠেন সাহিত্যচর্চায়। মহিষাদলে খুব বেশি দিন থিতু হতে পারেননি দীনেন্দ্রকুমার। নিদারুণ অর্থকষ্ট ও জীবন- জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে মহিষাদল ত্যাগ করে তাঁকে রাজশাহী চলে আসতে হয়। জেলা জজের কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেন। অর্থকষ্টের কারণে সেখানেও তিন বছরের বেশি স্থায়ী হতে পারেননি। তবে রাজশাহী অবস্থানকালে নাটোরের মহারাজা সাহিত্যসেবী জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-লেখক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদুনাথ সরকার, কবি রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্র-বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ করেন। দীনেন্দ্রকুমার 'সেকালের স্মৃতি' গ্রন্থে যদুনাথ সরকার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর কাছে যদুনাথ ছিল "দ্যুতিমান মধ্যমণি"– যাঁর উজ্জ্বল প্রভায় আজ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা গৌরবদীপ্ত।" ম্যাজিস্ট্রেট লোকেন্দ্রনাথ পালিতের আতিথ্য গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথও মাঝেমধ্যে রাজশাহীতে আসতেন। রাজশাহীতে লোকেন্দ্রনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

দীনেন্দ্রকুমার আশৈশব সাহিত্য-অনুরাগী। খুবসম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত হন এই আগ্রহ ও অনুরাগ। তাঁর বাবা ব্রজনাথ রায় ছিলেন কবি ও সাহিত্যব্রতী, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি 'আকিঞ্চনের মনের কথা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দশ বছর বয়সে দীনেন্দ্রকুমার সাক্ষাৎ লাভ করেন কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে। 'সেই সময় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল একবার মেহেরপুরে বেড়াইতে গিয়েছিলেন।' মেহেরপুরে ডিএল রায়ের কবিতাবিষয়ক বক্তৃতা শুনে দীনেন্দ্রকুমারের মধ্যে কবিতা তথা সাহিত্যপ্রীতি জন্মায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বড় ভাই রাজেন্দ্রলাল রায় সে সময় (১৮৭৯) মেহেরপুর কোর্টের হেডক্লার্ক ছিলেন। ভৈরব তীরবর্তী থানাপাড়ার দক্ষিণে মুখার্জি জমিদারদের নিভৃত বাংলোয় রাজেন্দ্রবাবু সপরিবার বাস করতেন। আত্মীয়তা ও সাহিত্যচর্চার সূত্রে কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)-এর সঙ্গেও দীনেন্দ্রকুমারের সখ্য-সম্পর্ক হয়েছিল। তিনি 'হরিনাথের কাছ থেকে সাহিত্য ছাড়াও সাংবাদিকতা এবং সাময়িকপত্র পরিচালনায়ও দীক্ষা পেয়েছিলেন।'[৯] মাত্র উনিশ বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা 'একটি কুসুমের মর্ম্মকথা'। তিনি যখন লিখতে শুরু করেছেন তখন বাংলা সাহিত্য প্রবেশ করেছে স্বর্ণযুগে। রবীন্দ্রনাথ প্রায়-পূর্ণমাত্রায় নিজেকে মেলে ধরেছেন। প্রকাশিত হয়েছে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', ও 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাস, নাটক ও কাব্যগ্রন্থ। গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নটী বিনোদিনীদের অভিনয়কুশলতায় কলকাতার রঙ্গালয়ে জমে উঠেছে থিয়েটারচর্চার আবহ। সেই সময়বৃত্তে বঙ্গীয় সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরেরও নামডাক ছিল, কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নকালে ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের পরিবারসহ বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে। পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠতা হয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রজনীকান্ত সেন ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রমুখের সঙ্গে। রাজশাহীর 'প্রবাস' জীবনে অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। দীনেন্দ্রকুমার 'ভারতবর্ষ' (অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সংখ্যা) পত্রিকায় 'কবি রজনীকান্ত' শীর্ষক স্মৃতিকথায় লেখেন: 'পূজার ছুটির পর তিনি বাড়ী হইতে রাজশাহীতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, আমিও ছুটির শেষে রাজশাহী যাইতেছিলাম... স্টিমারে উঠিয়া দেখি, স্টিমারের ডেকের উপর একখানি শতরঞ্চি বিছাইয়া রজনীকান্ত আড্ডা জমাইয়া লইয়াছে। তাহার গল্প আরম্ভ হইয়াছে।'[১০]

দীনেন্দ্রকুমার যে কতো অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রতিভাধর লেখক ছিলেন তা বারিদবরণ ঘোষকৃত 'দীনেন্দ্রকুমার রায়: জীবন ও সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

"দীনেন্দ্রকুমার ছিলেন আশ্চর্য স্মৃতিকথার মহান ভাণ্ডারী।' তিনি আরও লেখেন, মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর সেকালের স্মৃতি (১৩৩৯-৪৩) এক মহামূল্যবান স্মৃতিচারণা। এটি আশু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সেকালের যুগ ও জীবনের একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল আমাদের করায়ত্ত হতে পারবে।"

বলা যেতে পারে সেই কথা ভেবে কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স সেকালের স্মৃতি (১৯৮৮) গ্রন্থটি একালের পাঠকদের জন্য গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রকাশ করে। শুধু 'সেকালের স্মৃতি'ই নয় আনন্দ পাবলিশার্স দীনেন্দ্রকুমারের 'রচনা সমগ্র' (২০০৪) পুনঃপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি জয় গোস্বামী লিখেছেন, 'এই রচনাগুলির ধমনীতে যে রক্তস্রোত বয়ে চলেছে তা এই এক শতাব্দীকাল পেরিয়ে এসেও জীবন্ত রয়েছে। কারণ তার মধ্যে আছে স্নেহ করুণার সঞ্জীবনী। সকলকে নিয়ে, সমস্ত পড়শী, প্রতিবেশীকে সঙ্গে জড়িয়ে যে বেঁচে থাকা, তারই উদ্ভাসন আছে এই সব রচনায়।'[১১]

**চার.**

দীনেন্দ্র-জীবনের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের সূচনা হয় গুজরাটের বরোদায় এক মহান মানুষের প্রীতিসান্নিধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে তিনি এখানে অরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২-১৯৫০) বাংলা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস প্রথম আলোয় এসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে অরবিন্দ দেশে ফিরে (১৮৯৩) তদানীন্তন দেশীয় রাজা বরোদার মহারাজের চাকুরি গ্রহণ করেন। ইংরেজি ও ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও বাংলা ভাষার উপর তাঁর তেমন দখল ছিল না। বরোদায় অরবিন্দকে বাংলাভাষা শেখানোর দায়িত্ব নেন দীনেন্দ্রকুমার। অরবিন্দের গৃহশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকাল দীনেন্দ্রের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, সেটা তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'সেকালের স্মৃতি' গ্রন্থে। মাত্র সাত বছর বয়স থেকে বিলেতে অবস্থানের কারণে অরবিন্দ ভাল বাংলা শিখতে পারেননি। কিন্তু বাংলা ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতি ছিল তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ। তিনি ও তার অভিভাবকেরা আগ্রহ সহকারে এমন একজন দক্ষ বাংলা শিক্ষকের খোঁজ করছিলেন, যিনি হবেন বাংলা ভাষার সুপাণ্ডিত। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে দীনেন্দ্রকুমারকে বাংলা শিক্ষকের দায়িত্বভার প্রদান করা হয়, দায়িত্ব পেয়ে দু বছর বরোদায় অবস্থান করেন। অরবিন্দের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত চারিত্রিক দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রসারিত সৌন্দর্য, সহজ 'সাদা সিধে জীবনযাপন' এবং 'প্লেইন লিভিং হাই থিংকিং'-এর মতো মহৎ আদর্শে দীনেন্দ্রকুমার গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'অরবিন্দ আজন্ম সন্ন্যাসী। বাল্যকাল হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহাকে ইংল্যান্ডে বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বিলাস লালসা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই..... আমি দুই বৎসরের অধিককাল তাহার বঙ্গভাষার শিক্ষকরূপে তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিয়াছি। কিন্তু কোনোদিন তাহাকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দেখি নাই।'[১২]

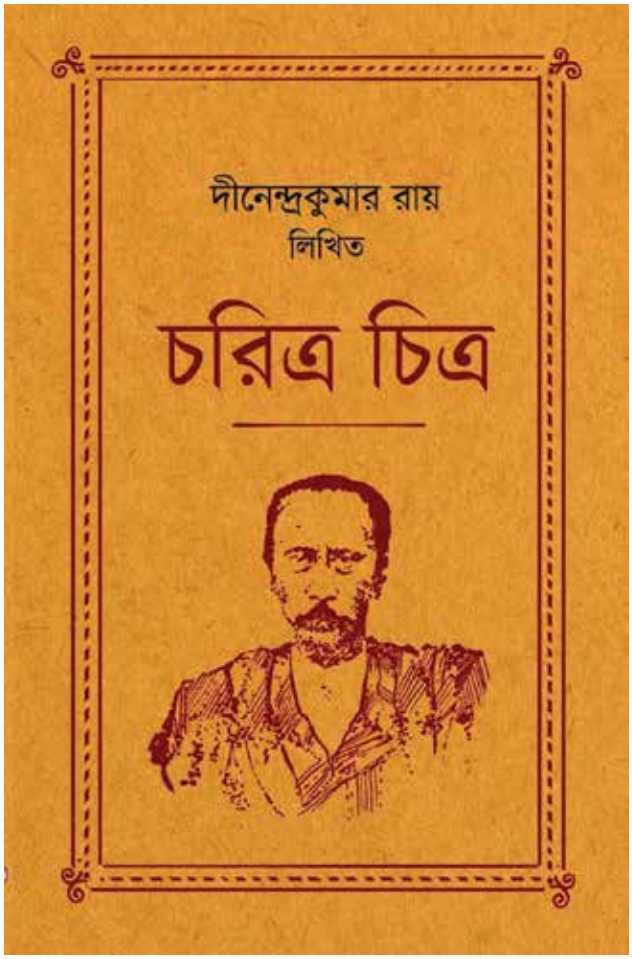


বরোদা-পর্বের শেষ পর্যায়ে সাহিত্যিক হিসেবে দীনেন্দ্রকুমারের সুখ্যাতি বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও পাঠকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বসুমতী' (১০ ভাদ্র ১৩০৩) পত্রিকা। সম্পাদক জলধর সেনের আহ্বানে বরোদা ছেড়ে দীনেন্দ্রকুমার বসুমতী পত্রিকায় যোগদান করেন সাংবাদিক হিসেবে। সাহিত্যসাধনা ও সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যানজ্ঞান ও জীবিকার অবলম্বন। ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ খ্যাতিমান সাংবাদিকদের প্রীতিসান্নিধ্যে রপ্ত করেন সাংবাদিকতার কলা-কৌশল। স্বীয় প্রতিভাগুণে দীনেন্দ্রকুমার এক পর্যায়ে বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। বসুমতীতে দু' হাত ভরে তিনি লিখতে থাকেন সৃজনশীল, মননশীলসহ নানা সব ফরমায়েসি লেখা, বসুমতী'র পাতায় তাঁর এত লেখা মুদ্রিত হয়েছে যে এগুলোর অধিকাংশই অগ্রন্থিত রয়েছে অদ্যাবধি। *প্রেতপুরী*, *কথাশিল্পীর হত্যা রহস্য*, *প্রলয়ের আলো* উপন্যাস বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'নন্দন কানন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। এতে প্রকাশিত হয় তাঁর 'রহস্য লহরী', এই রহস্য সিরিজ তাঁকে পরিয়ে দেয় বিপুল খ্যাতির মুকুট। রহস্য কাহিনীর বা ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখক হিসেবে তাঁর প্রভাব-পরিচিতির পিছনে পত্রিকাটির উল্লেখ্যনীয় ভূমিকা রয়েছে,

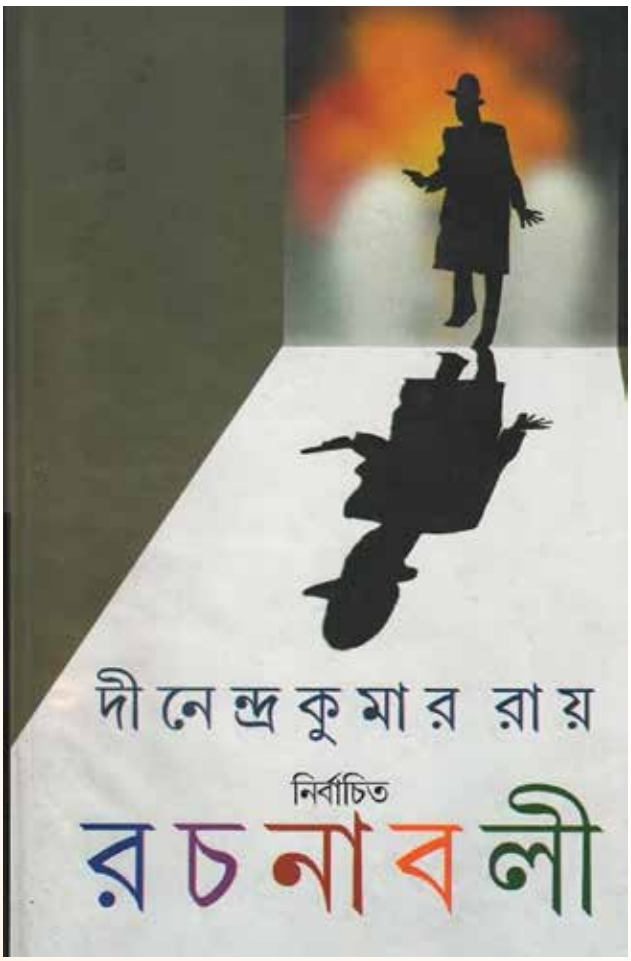


যা বলাই বাহুল্য। তারপরও বলতে হয়, এই পরিচয় কোনোভাবেই তাঁর মুখ্য-পরিচয় নয় বরং খুবই গৌণ-পরিচয়। কিন্তু কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচক অপেক্ষাকৃত গৌণ পরিচয়কে প্রধান করতে গিয়ে তাঁর সত্যিকার-পরিচয়টাই ঢেকে দিয়েছেন। পল্লীচিত্র (৮ডিসেম্বর ১৯৮১) পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কে তাই আচার্য সুকুমার সেন বলেন, "এখন যারা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নাম শ্রুত আছেন; তারা জানেন তাঁকে রহস্যলহরী সিরিজের গ্রন্থকর্তারূপে, 'মিষ্টার ব্লেকে'র স্রষ্টা রূপে। কেউ কেউ তাঁকে 'মেয়ে বোম্বেটে', 'জাল মোহান্ত' অথবা 'পিশাচ পুরোহিত' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক বা অনুবাদক রূপে জানেন।" মৃত্যুর (২৭ জুন, ১৯৪৩) পরও দীনেন্দ্রকুমার এক শ্রেণির পাঠকের কাছে লঘুরসের রচয়িতা হিসেবেই চিহ্নিত আছেন। অথচ এসব লেখা বা অনুবাদ তাঁর সৃষ্টিকর্মের আসল দিক নয়। তার শ্রেষ্ঠকীর্তি উনিশ শতকের গ্রামবাংলাকে নিয়ে লেখা রচনাবলী। উনিশ শতকের গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উৎসব-পার্বণ নিয়ে রচিত তাঁর পল্লীচিত্র (১৩১১), পল্লীবৈচিত্র্য (১৩১২), পল্লীকথা (১৩২৪) প্রভৃতি পল্লিবিষয়ক রচনাবলী তাঁর সাহিত্যিক জীবনের এক অনন্য কীর্তি।

**পল্লীচিত্র** গ্রন্থে উনিশ শতকের মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন বর্ধিষ্ণু গ্রাম বিশেষত নদীয়ার মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার জনজীবনের নানা রঙিন ছবি আঁকা হয়েছে। উনিশ শতকের গ্রাম মানে বারো মাসে তের পার্বণ, নানা ধরনের পালা-পার্বণ, ধর্মীয় আচার-আমোদ-উৎসবে গ্রামবাসী মেতে থাকত। গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হত রথযাত্রা, স্নানযাত্রার মেলা, বৈশাখ সংক্রান্তি, নন্দ উৎসব, চড়ক, গাজন উৎসব। পাঠকসমাদৃত এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় আঁকা হয়েছে সেকালের সৌহার্দ্য সম্প্রীতিমুখর গ্রাম আর আনন্দ-উৎসবময় জনজীবনের নানা খণ্ডচিত্র। দীনেন্দ্রকুমার রায় 'পল্লীচিত্র'-এ সেকালের পল্লীজীবনের যে- বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আবেগের আতিসহ্য কিংবা বাড়াবাড়ি নেই। আছে প্রতিদিনের ঘটে-যাওয়া সাধারণ ঘটনা অসাধারণভাবে তুলে ধরার আন্তরিক প্রয়াস। পল্লীচিত্র অনেক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা শেখার পাঠ্যগুলির অন্যতম ছিল। অথচ নিজ দেশ বাংলাদেশের তিনি কেবল উপেক্ষিত নয়, একেবারে বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত। মনে কেবল প্রশ্ন জাগে, কার দোষে বাংলাদেশের পাঠককুল তাঁকে ভুলে গেল? কার অভিশাপে তিনি বিস্মৃত হলেন? কেন তিনি অবজ্ঞা, অবহেলা ও উদাসীনতার শিকার হলেন? সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশের কোনো গবেষণা-প্রতিষ্ঠান কিংবা সাহিত্যবোদ্ধা সাহিত্যের এই নিবেদিত-প্রাণ মানুষটির সাহিত্যিসম্ভার এবং সেগুলির শিল্প-সৌকর্য সম্পর্কে খোঁজ করার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেননি। অথচ তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুস্থ-রুচির সাহিত্যচর্চার নিরলস কর্মী। 'দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যকর্মের যেদিকটি আমাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে, তা হলো মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি তাঁর আস্থা। রহস্য-উপন্যাসই হোক আর পল্লীচিত্রই হোক, তাঁর সামাজিক মনটি সব রচনায়ই পাওয়া যাবে। তাঁর মানবিক মূল্যবোধের আরেক দিকে আছে স্বাভাবিক সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তীব্র আগ্রহ।'[১৩]

## পাঁচ.

পল্লীচিত্র'র মতো 'পল্লীবৈচিত্র্যে' (১৩১২) বাংলার পল্লী অঞ্চলের নানাদিক বর্ণনা করা হয়েছে। বইয়ের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'পল্লীচিত্রে পল্লী সমাজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতে পারি নাই সেই সকল কথায় আলোচনা করিলাম।' বইটি উৎসর্গ করেন, 'বঙ্গজননীর সুসন্তান ও বঙ্গ সাহিত্যবৎসল' ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যকে, ভূমিকা লেখেন সাহিত্যিক জলধর সেন। গ্রন্থভুক্ত এগারটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সমকালে অর্থাৎ উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত কালখণ্ডের অবিভক্ত বাংলার প্রায় সব গ্রামে কার্ত্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত যেসব সামাজিক ও লৌকিক উৎসব এবং ধর্মানুষ্ঠান চলত তারই আবেগঘন বর্ণনা 'পল্লীবৈচিত্র্য'।

প্রথম প্রবন্ধ কালীপূজা। এখন কালীপূজা দূর্গাপূজার মতোই সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে, কিন্তু অষ্টাদশ শতকে শক্তির আরাধনায় ডাকাতরা কালীপূজার আয়োজন করত। দীনেন্দ্রকুমার কালীপূজা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। বইয়ের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে– ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, কার্তিকের লড়াই, নবান্ন পোষলা, পৌষ সংক্রান্তি, উত্তরায়ন মেলা, শ্রী পঞ্চমী, শীতল ষষ্ঠী, দোলযাত্রা ও চড়ক। গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধ হলো পৌষ সংক্রান্তি। 'পৌষ মাসকে পল্লী রমণিগণ লক্ষ্মী মাস বলিয়া মনে করেন। কোন রমনী পৌষ মাসে স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে বা পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে গমন করে না।'[১৪]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় না থাকায় পৌষ মাস থেকেই বাংলার গ্রামগুলো উৎসবমুখর হয়ে উঠত। গ্রামের মানুষ পৌষ মাসে শীতের নিমন্ত্রণে পাড়ায় পাড়ায় আয়োজন করতো যাত্রাপালা, কীর্তন, সার্কাস, নাচ-গান, মাদার পীরের গান, মানিক পীরের গান ইত্যাদি। পৌষ মাসের শেষ দিবসে উনিশ শতকের গ্রাম বাংলায় অনুষ্ঠিত হত পৌষ সংক্রান্তি। '৩০ পৌষ রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই পল্লীবাসী..... শ্রমজীবীগণের ছেলেরা আনকোরা ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হইত। এ তাদের সখের ভিক্ষা।'[১৫] পৌষ সংক্রান্তি উৎসব প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবে পৌষ মাসে মানিকরের গান আজও গ্রামবাংলায় হয়, যা সেকালেও হতো। সেকালে মুসলমান শ্রমজীবীগণ টুপি মাথায় দিয়ে গলায় রুমাল বেঁধে মানিকপিরের গান গাইতে গাইতে ঢোল বাজাতে বাজাতে দলে দলে গৃহস্থ গৃহে উপস্থিত হত। পৌষ সংক্রান্তি উৎসবের কৃত্যাচারগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ এসব কৃত্যাচার ও অনুষ্ঠানের গভীরে লুকিয়ে আছে আমাদের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নানা অজানা দিক।

ডিটেকটিভ উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে খ্যাত দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যবোধ ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর নানা ছোটগল্পে। এসব ছোটগল্পে পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা ও বেদনার নানা উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলিতে রয়েছে হত্যার রহস্য, ভৌতিক পরিবেশ, হাস্যরস এবং তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ পল্লীজীবন। সামান্য ঘটনা যে-অসামান্য হয়ে উঠতে পারে তার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর গল্পের বর্ণনা ও বুনটে। শিশির কুমার দাস তাঁর 'বাংলা ছোটগল্প' (প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ১৯৬৩, কলকাতা) গ্রন্থে দীনেন্দ্রকুমারের গল্প সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর সৃষ্টি অতি সহানুভূতিশীল। অনেক পরিমাণে তিনি বাস্তবানুগ, খুঁটিনাটি তথ্যের প্রতি তার আসক্তি, অত্যধিক ভাবালুতা তার দোষ। কিন্তু বর্ণনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের শুধু পূর্বসূরীই নয়, শরৎচন্দ্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট।'[১৬] তবে শরৎচন্দ্রের পল্লিচিন্তা ও দীনেন্দ্রকুমারের পল্লিচিন্তার মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। তবুও পল্লীই তার চিন্তাবিশ্ব ও গল্পের প্রধান প্রসঙ্গ। আগমনী, পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যান, বিজয়ার মিলন প্রভৃতি পল্লিবিষয়ক গল্প বিশ শতকের পাঠকমহলে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে। শিশিরকুমার আরও বলেছেন, 'দীনেন্দ্রকুমারের ঘটনাগুলি অতি তুচ্ছ ও অতি সাধারণ। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী তিনি। বিভূতিভূষণের পল্লিজীবনের ঘটনাগুলিতে যেমন অতি তুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় করে গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তেমনি দীনেন্দ্রকুমারের।' বাংলাদেশের পল্লী গ্রাম নিয়ে তিনি যে-ভাবনা চিন্তা করেছিলেন সেগুলি তাঁর ছোটগল্প ও পল্লিবিষয়ক রচনাতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসী পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৪০ সংখ্যা) প্রিয়রঞ্জন সেন বাংলা সাহিত্যের একশতটি ভাল বই এর যে তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন তাতে দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীচিত্র বইটি স্থান পেয়েছে। *পল্লীবৈচিত্র্য (১৩১২), পল্লীবধূ (১৩২৩), পল্লীচরিত্র (১৩২৩), পল্লীকথা (১৩২৪)* প্রভৃতি গ্রন্থও পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছে। জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়েরও বহু পল্লিবিষয়ক রচনা রয়েছে। কিন্তু সেইসব রচনা তেমন স্বাভাবিক, সুন্দর ও সুস্বাদু ছিল না। কারণ দীনেন্দ্রকুমার যতটা পল্লিবাংলাকে আপন ভাবতে পেরেছিলেন তাঁরা ততোটা পারেননি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জনপ্রিয় 'সাহিত্য' পত্রিকাতে দীনেন্দ্রকুমারের অধিকাংশ পল্লিবিষয়ক রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। সুরেশ সব সময় দীনেন্দ্রকুমারের রহস্য লহরী বা রহস্যকাহিনীর চেয়ে পল্লিবিষয়ক ও মননশীল রচনা প্রকাশে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তার পল্লিবিষয়ক রচনা প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

## ছয়.

দীনেন্দ্রকুমার রায় জীবনের একটি বড়ো অংশ অতিবাহিত করেন কৃষ্ণনগর, রাজশাহী, মেদিনিপুর, বরোদা, কলকাতাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর-মহানগরে। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান 'মেহেরপুর' নামক বর্ধিষ্ণু গ্রামটির কথা কখনোও বিস্মৃত হননি। সময়-সুযোগ পেলেই ছুটে আসতেন মেহেরপুরে, কর্মসূত্রে কলকাতার মহানাগরিক হয়েও মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ। জীবনের শেষ দিকে বসবাসের জন্য 'রিক্তহস্ত নিরলম্বন' হয়ে মেহেরপুরেই ফিরে আসেন। ১৯৪৩ সালের ২৭ জুন তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর পর নিজগ্রাম মেহেরপুর কিংবা কলকাতার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় কোনো সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায় না। যে-বসুমতী পত্রিকার জন্য তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সোনালী অধ্যায় উৎসর্গ করেছিলেন, সেই বসুমতীও তাঁর স্মৃতিরক্ষায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি বা করতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় আটটি দশক পার হয়েছে, কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যপ্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। অথচ সাহিত্যসাধক

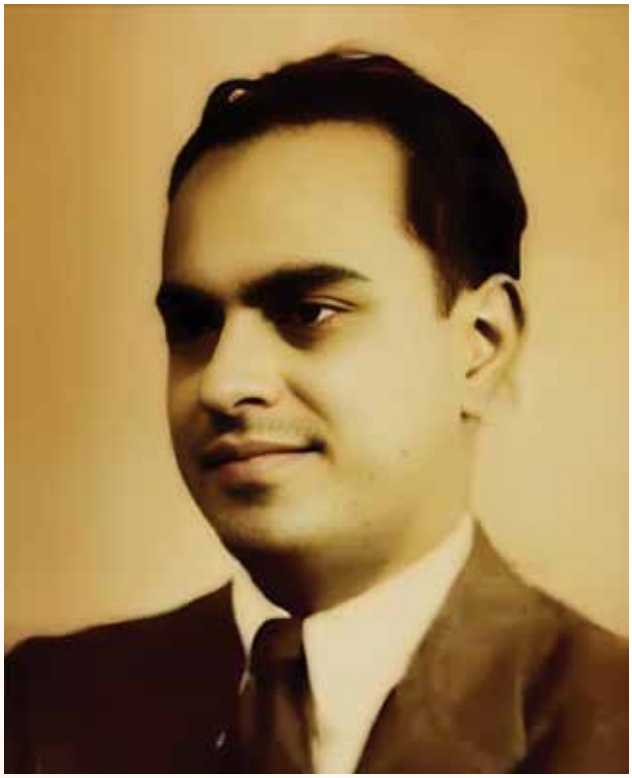

হিসেবে তিনি ছিলেন দিগন্তবিস্তারী প্রতিভার অধিকারী। দীনেন্দ্রকুমারের সুনিপুণ তুলির স্পর্শে ছোট ছোট ঘাট-পুকুর, দিঘি, ছায়া সুনিবিড় পল্লী, ছোট পার্বণ-উৎসবের মতো সামান্য বিষয়আশয়ও অসামান্য হয়ে উঠেছে। 'পল্লীর তুচ্ছ ঘটনা কতো হৃদয়গ্রহী ও মমত্বে পরিপূর্ণ হতে পারে, পেন-ইঙ্কের স্কেচের মতো কতো তার ডিটেইলের কাজ হতে পারে, তা দীনেন্দ্রকুমার কথায় এঁকে প্রমাণ করেছেন। এদিক দিয়ে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের অগ্রজ।'[১৭] কোন ধরনের জীবন একদিন আমাদের ছিল, কোন ধরনের শ্যামলছায়া, জ্যোৎস্না রাত, রোদ-বৃষ্টি পেরিয়ে আজ আমরা এতদূর এসেছি, তা তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি। আমরা আমাদের দেশের অতীতকে, পিতামহ-প্রপিতামহদের উদ্বেগহীন, আনন্দময় জীবনের সঙ্গে যদি নিজেদের যোগসূত্র স্থাপন করতে চাই, তাহলে দীনেন্দ্রকুমারের স্মৃতিকথন, গল্প, পল্লিবিষয়ক রচনা, আত্মজীবনীর পাঠ গ্রহণ করতেই হবে। যাদের গবেষণার আগ্রহ রয়েছে তারা হয়তো তাঁর রচনা থেকে একাধিক থিসিসের রসদ পেতে পারেন। নিখাদ বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধান পেতে, আনন্দময় ও উৎসবমুখর বাংলাদেশকে আবিষ্কার করতে এ যুগের নির্বিশেষ পাঠককে অবশ্যই দীনেন্দ্রকুমারের কাছে যেতে হবে। রাজনৈতিক উত্থান-পতনে বাংলাভাষার ভূগোল বদলেছে, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অভিঘাতে বদলেছে বাঙালির জীবন জীবিকা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্যাটার্ন। বিশ্বায়ন ও নগরায়নের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে লুপ্ত, অপহৃত ও বিধ্বস্ত হয়েছে বাংলাদেশের শাশ্বত গ্রামের নীলিমা ও সৌন্দর্য। কিন্তু এই ঐশ্বর্যহীন, বিধ্বস্ত পল্লী যে একদিন প্রাণরসের আধার ছিল, মুখর থাকত উৎসব-আনন্দে, সম্প্রীতিতে তা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রসমণ্ডিত পল্লিবিষয়ক রচনা পাঠ করলেই কেবল আমরা জানতে পারি।

**তথ্যসূত্র:**


১. দীনেন্দ্রকুমার রায়: রচনাসমগ্র। কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪। পৃষ্ঠা: ভুমিকা-১

২. আসজাদুল কিবরিয়া: কাজীদার সেবা প্রকাশনী, প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪

৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: প্রথম আলো, ২য় খণ্ড। কলকাতা, জুলাই ১৯৯৭। পৃ: ৪৩৩

৪. শতঞ্জীব রাহা: কথাচিত্রকর দীনেন্দ্রকুমার রায়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯। পৃষ্ঠা: ৯২

৫. উদ্ধৃত : প্রকাশকের নিবেদন, সেকালের স্মৃতি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৮

৬. মনি বর্ধন : বাংলার লোকনৃত্য ও গীবিবৈচিত্র্য। কলকাতা, সেপ্টেম্বর ০০৪। পৃ: অ-৯

৭. শতঞ্জীব রাহা: কথাচিত্রকর দীনেন্দ্রকুমার রায়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯। পৃষ্ঠা:১৬

৮. দীনেন্দ্রকুমার রায়: সেকালের স্মৃতি। রচনাসমগ্র, পৃ: ৩৭১

৯. শতঞ্জীব রাহা: ব্রাত্য বুদ্ধিজীবী হরিনাথ মজুমদার

১০. দীনেন্দ্রকুমার রায়: 'কবি রজনীকান্ত'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সংখ্যা

১১. দীনেন্দ্রকুমার রায়: ভুমিকা, রচনাসমগ্র। কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪। পৃষ্ঠা: ভুমিকা-১

১২. দীনেন্দ্রকুমার রায়: সেকালের স্মৃতি, রচনা সমগ্র, পৃষ্ঠা: ৩০০

১৩. শতঞ্জীব রাহা: কথাচিত্রকর দীনেন্দ্রকুমার রায়। কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯। পৃষ্ঠা: প্রথম সংস্করণের কথামুখ

১৪. দীনেন্দ্রকুমার রায়: পৌষ সংক্রান্তি। পল্লী বৈচিত্র্য, রচনা সমগ্র। পৃষ্ঠা-১৫১

১৫. দীনেন্দ্রকুমার রায়: পৌষ সংক্রান্তি, পল্লী বৈচিত্র। দ্বি-স, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৬। পৃষ্ঠা- ১৫১

১৬. শিশির কুমার দাস: 'বাংলা ছোটগল্প'। প্রথম প্রকাশ- কলকাতা, অক্টোবর ১৯৬৩। পৃষ্ঠা: ১১২

১৭. বারিদবরণ ঘোষ: দীনেন্দ্রকুমার রায়: জীবন ও সাধনা, পল্লীবৈচিত্র্য, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯



আবদুল্লাহ আল আমিন: সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ


**তুমি যদি কাউকে ভালোবাসো তবে তাকে ছেড়ে দাও। যদি সে তোমার কাছে ফিরে আসে তবে সে তোমারই ছিল। আর যদি ফিরে না আসে, তবে সে কখনই তোমার ছিল না।**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# নাসরীন জাহানের ছোটগল্প: নৈঃসঙ্গ্য ও বিবিক্তির রূপায়ণ

মঈনুল ইসলাম

ছোটগল্প কথাসাহিত্যের তুলনামূলক নবীন শাখা হলেও বর্তমান কর্মব্যস্ত মানুষের সাহিত্য পিপাসা মেটাতে এর আবেদন ও পাঠকপ্রিয়তা সর্বাধিক। সমকালীন সাহিত্যে বাংলা ছোটগল্প পাঠকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মানব মনের চিন্তাচেতনার যে অভিঘাত সংঘটিত হয় তার উপর তির্যকভাবে আলোক সম্পাত করে একজন ছোটগল্পকার যে ছবি তুলে আনেন তা একাধারে মানুষের মন-মানসিকতা ও সমসাময়িক সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবেই উঠে আসে।[১] বাংলাদেশের ছোটগল্প সত্তরের দশক থেকে গঠন-বিন্যাসে ও বিষয়-বৈচিত্র্যের বহুমুখি ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে বেশ কিছু প্রতিভাবান ছোটগল্পকার বাংলা ছোটগল্পের খোলনলচে পরিবর্তন করে দেন। বাংলা ছোটগল্প কেবল কাহিনী বর্ণনা ও ঘটনা সংঘটনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সাম্প্রতিক ছোটগল্প তার অঙ্গ থেকে ঝরিয়ে ফেলেছে সরল প্লট, ঘটনার ধারাবাহিকতা, বর্ণনার সরলতা, জীবনের বহিবৃত্ত এবং বিষয়ের একমুখি অনিবার্যতা।[২] এ-দশকেই বাংলা ছোটগল্পে মনোবিকলন, পরাবাস্তববাদ, লিবিডোচেতনা ও জাদুবাস্তবতা নান্দনিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা গল্পে কাহিনীর সরল বর্ণনার স্থলে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনবিশ্লেষণের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। সত্তরের দশকে বাংলা ছোটগল্পকে যারা এ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), বশীর আল হেলাল (১৯৩৬-) হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৮৪৩-১৯৯৭), অন্যতম। বস্তুবাদী চেতনার প্রকাশকল্পে হাসান আজিজুল হক তাঁর ছোটগল্পে আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতায় নিষ্পিষ্ট নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আর্তি বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।[৩] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার গল্পে মানুষের অন্তর্জীবনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পরাবাস্তব ভাবকে আশ্রয় করে সৃষ্টি করেছেন অভিনব চমক।[৪] সৈয়দ শামসুল হকের ছোটগল্পের চরিত্রগুলো অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। তার গল্পের লিপিচাতুর্য ও বাকনির্মিতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৫] বশীর আল হেলালের ছোটগল্পে গ্রামীণ সমাজ জীবনও নিসর্গের শৈল্পিক চিত্রায়ণ হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামরত মানুষ যে বৈচিত্রের ধারক, কোন কোন গল্পে এ বিয়টিই প্রাধান্য পেয়ে লেখকের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে।[৬] আশির দশকে বাংলা ছোটগল্প বহুমুখি ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বৈচিত্র্য আনে দেশের তরুণ সাহিত্যসেবীদের আয়োজনে প্রকাশিত বিভিন্ন ধারার লিটিল ম্যাগাজিন।[৭] মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রাম এবং নগর একাকার হয়ে গেছে এক ভয়াবহ বিষণ্নতা গ্রাম এবং নগরকে গ্রাস করেছে। সেই বিষণ্নতা, নৈঃসঙ্গতা, বিবমিষা থেকে আশির দশকের গল্পকাররা বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আশির দশকের ছোটগল্পকারদের গল্পে নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈরাজ্যমূলক মানসিকতা, পাপবোধ, আত্মগ্লানি, লোভ, যৌনপ্রবৃত্তি, বিপন্নতা, অস্তিত্বের সংকট, দাম্পত্য জীবনের অস্থিরতা ও দারিদ্রের উপাখ্যান প্রতিফলিত হয়েছে। এই দশকের গল্পকারদের মধ্যে মঞ্জু সরকার, মঈনুল আহসান সাবের, ইমদাদুল হক মিলন ও নাসরীন জাহান (১৯৬৪-) অন্যতম।

আশির দশকের কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে নাসরীন জাহান অনন্য ও বিশেষ উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। বিষয় ভাবনায় নতুনত্ব ও স্বকীয়, গদ্যশৈলীর জন্য তিনি অনবদ্য। আধুনিক জটিল জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা, ভঙ্গুরতা ও ভণ্ডামি তার কথা সাহিত্যে উঠে এসেছে শৈল্পিক সৌকর্যে। এ দশকের অন্যদের চেয়ে তিনি কিছুটা ব্যতিক্রমী এজন্য যে, তার গল্পে মানুষের বহির্জগতের চেয়ে অন্তর্জগতের প্রতিফলন প্রবল। নাসরীন জাহান তার ছোটগল্পে গভীর মমতায় এঁকেছেন পরাবাস্তববাদ, লিবিডোচেতনা, মনোবিকলন ও দৈন্যের করুণ গাঁথা। তাঁর লেখায় নারীবাদী আদর্শ, পিতৃতন্ত্রের আধিপত্য, জীবনের ক্লেদ, বিবমিষা ও অস্বিত্বের সংকট ঘুরে ফিরে এসেছে। নারীর প্রতি বৈষম্য ও প্রবঞ্চনা তার গল্পে উপজীব্য মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়। নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণের নানা দিক, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, পাওয়া না পাওয়ার চিত্র, নর-নারীর যৌন জীবন[৮] নাসরীন জাহানের ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে।

নাসরীন জাহানের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: স্থবির যৌবন (১৯৮৫), বিচূর্ণ ছায়া (১৯৮৮), সূর্যতামসী (১৯৮৯), পথ হে পথ (১৯৮৯), কাঠপেঁচা, সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে উঠে, নির্বাচিত গল্প (২০০২)। নাসরীন জাহানের ছোটগল্প বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চারটি বৈশিষ্ট্যকে অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। (ক) নৈঃসঙ্গ্যচেতনা (খ) বিচ্ছিন্নতাবোধ (গ) দারিদ্রতা ও (ঘ) উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা।[৯] তাঁর গল্পে চরিত্রেরা কোথাও কোথাও এই

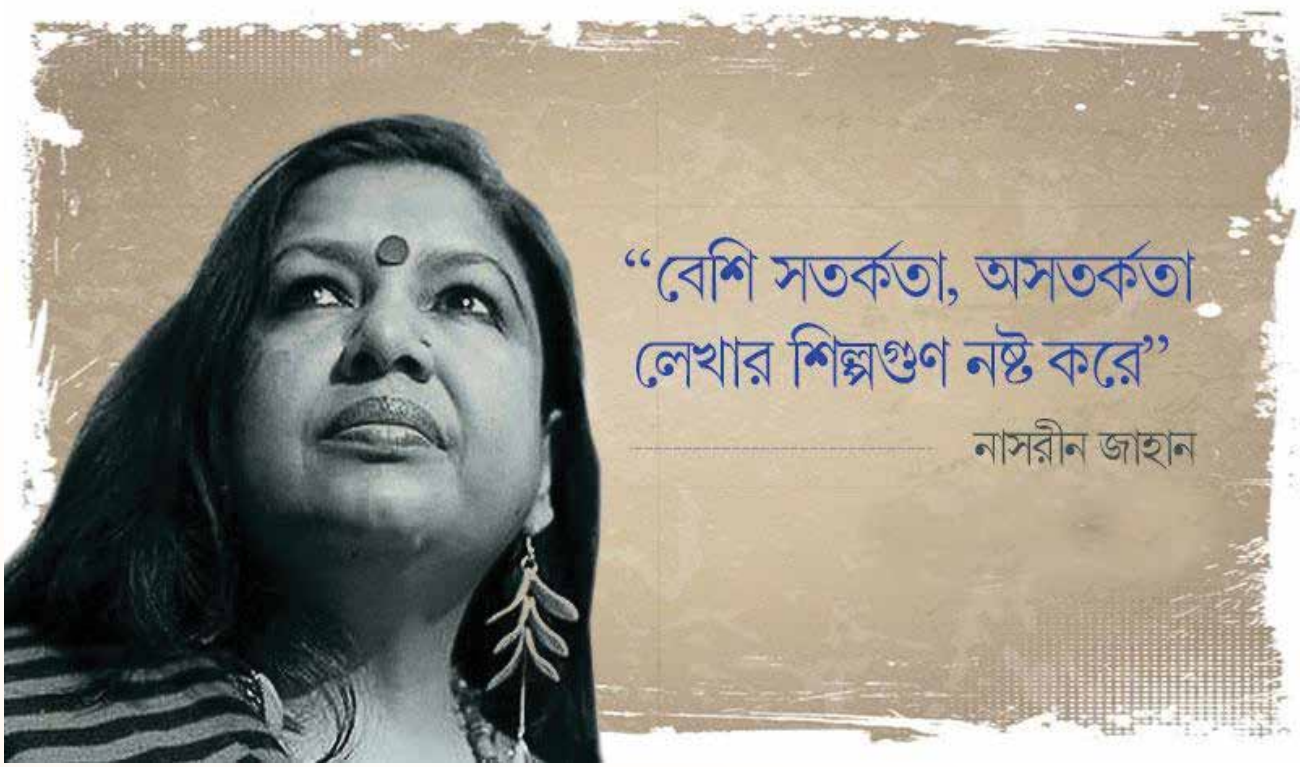


নিসঃসঙ্গতা, বিবিক্তি ও দারিদ্রতা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করেছে।

সমকালীন বাস্তবতায় প্রজ্জ্বল 'সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে' গল্পটি। চেতনা-প্রবাহ রীতিতে রচিত এ গল্পে নায়িকার আত্মকথনে উঠে আসে তার উপর সংঘটিত নিষ্ঠুর বলাৎকার ও বলাৎকার পরবর্তী সমাজ সংসারের অবজ্ঞা ও ঘৃণা। গল্পের নায়িকা নিশি প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। একজন ধর্ষিতার জীবন যে কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে তা নিশির আত্মকথনে ফুটে উঠেছে। নিশি ভাবে এ ধর্ষিত জীবন নিয়ে সে কি করবে? আত্মহত্যায় তাঁর একমাত্র মুক্তির পথ! সমাজ সংসার হতে সে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা নিশির ব্যক্তি চিত্তে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। বিরুদ্ধ সমাজ প্রতিবেশের কারণে মানুষের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয় তখন স্বভাবতই মানব চিত্তে জন্ম নেয় উদ্বেগ। উদ্বেগ যতই বাড়ে ততই বৃদ্ধি পায় ব্যক্তি অস্বিত্বের ভীতি; এবং এভাবে ক্রমেই বেড়ে চলে ব্যক্তির বিচ্ছন্নতাবোধ। তীব্র উদ্বেগের পরিণামে সৃষ্টি হতে পারে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মানসবিকৃতি; খণ্ড-বিখণ্ড হতে পারে তার সত্তা, যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য সে খুঁজে নিতে পারে আত্মহননের পথ। পৃথকত্বের অনুভব থেকে ব্যক্তি চৈতন্যে কখনো কখনো জাগ্রত হয় লজ্জা, পলায়নপরতা ও অপরাধবোধ; অতলান্ত নিঃসঙ্গতা কখনোবা জন্ম দেয় অসহায়ত্ববোধ, উন্মত্ততা ও সিজোফ্রেনিয়া। আমরা নিশির মানস-চারিত্র্য বিশ্লেষণ করলে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অস্বিত্ব লক্ষ্য করি। নিজের ধর্ষণের বিবরণ উকিলের কাছে ও আদালতে বারবার দিতে গিয়ে সে হাফিয়ে ওঠে। ধর্ষণ নিয়ে এই বিবৃতি তাকে নতুন করে প্রতিবারই ধর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সকলে যেন তাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলছে, তুমি সাধারণ নারী নও, তুমি ধর্ষিতা। সে ভাবে এই ধর্ষকদের শাস্তি দিয়ে কি হবে। সে কি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে? আবার ভাবে সতীত্ব! সে তো অনেক আগেই হারিয়েছে, তার প্রেমিক রঞ্জুর কাছে।

নিশি ধর্ষিত হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই রঞ্জু অন্য মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে বউ নিয়ে আসে। কবি-স্বভাব রঞ্জু লোক লজ্জার ভয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনলেও নিশিকে ভুলতে পারে না। তাইতো সে একদিন নিশিদের বাড়িতে এসে নিশিকে শহরের হোস্টেলে গিয়ে লেখাপড়া করে নতুন করে জীবন শুরু করতে বলে। নিশির প্রতি রঞ্জুর এই উপদেশ, রঞ্জুকে নিশির চোখে আরো হীন করে তোলে। রঞ্জুর প্রতি তার করুণা হয়। নিশি রঞ্জুকে বলে- 'তুমিই একদিন বলেছিলে মানুষ সবচেয়ে বিপন্ন একটি জায়গাতেই, সে কি চায় তা সে জানে না। তুমি এখন যাও বড় করুণা হচ্ছে তোমার জন্য।' নিশির পরিবার, সমাজ, আত্মীয়-পরিজন, ঘরের আসবাব, সমস্ত কিছুই যেন স্বাপদের মতো ধেয়ে আসছে তাকে হত্যা করতে। জীবনের প্রতি সমস্ত আগ্রহ সে হারিয়ে ফেলে। এমন সময় একজন সৌম্য সুন্দর যুবক তাদের বাড়িতে আসে। তিনি মনোরোগ চিকিৎসক। তিনি নিশিকে বলেন 'সতীত্বের হাস্যকর কনসেপ্ট পৃথিবী থেকে বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে।' নিশির বোধদয় হয়। সত্যিইতো 'সে মরবে আর ওই কুৎসিত মুখগুলো সদর্পে নাচবে এই পৃথিবীর ওপর?' সে আবার নিজেকে নতুনভাবে প্রস্তুত করে। বাড়ি থেকে

বেরিয়ে পড়ে। গল্পের শেষে লেখক নিশির নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়ে গল্পটি শেষ করেছেন। যা আমাদের আশাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করে।

'এলানপোর বিড়াল' গল্পেও নায়িকার নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় নায়ক যেমন কোন অপ্রাপ্তি না থাকা সত্ত্বেও অসীম নিঃসঙ্গতায় ভুগে আত্মহত্যা করে। তেমনি 'এলানপোর বিড়াল' গল্পের নায়িকাও স্বামী সংসার, স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ নৈঃসঙ্গ্য অনুভব করে। বিয়ের পর এক বছর কেটে গেলেও মেয়েটি তার স্বামীকে একান্ত আপনার করে পায় না। সব সময় সে নিজেকে স্বামীর পছন্দের মতো করে উপস্থাপন করেছে। একটি দিনের জন্য সে স্বামীকে নিজের করে চেয়েছিল। তাও সে পায়নি। আর এ থেকে তার ভেতরে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা, হতাশা থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা থেকে নৈঃসঙ্গ্য ও বিবমিষা। ভালবাসার উৎস হারিয়ে সে হয়ে পড়ে আরো বেশি নিঃসঙ্গ আরো বেশি বিচ্ছিন্ন। পরাবাস্তবে আচ্ছন্ন হয়ে মেয়েটি কল্পনায় দেখতে পায় সেই বিড়াল, যে বিড়ালটি এডগার এলানপোর বিড়াল গল্পের নায়িকার হন্তারক স্বামীকে ধরিয়ে দিয়েছিল দেয়ালের মধ্যে লুকিয়ে থেকে। মেয়েটি এলানপোর বিড়াল গল্পের সমান্তরালে নিজের অস্তিত্বের মাঝে গল্পের নায়িকার অস্তিত্ব কল্পনা করে; এবং এ অবস্থায় সে তার স্বামীকে গল্পের নায়িকার স্বামীর প্রতিতুলনীয় মনে করে। মেয়েটির পরাবাস্তবাদী চেতনার মানসিকতায় কিছুটা প্রশান্তির বাতাস লাগে যখন বিড়ালটি সত্য উদঘাটনের প্রতীকে পরিণত হয়।

তথাকথিত ভদ্র সমাজের মুখোশধারী ব্যক্তির দুর্নীতি, দুর্নীতি থেকে সৃষ্ট পাপবোধ, আত্মগ্লানি, ক্লেদ ও অপচয়িত হয়ে যাওয়া মানসবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ল্যাম্পপোস্টের নিচে' গল্পের মুশতাক আহমেদ। মুশতাক আহমেদের ছেলে জন্ডিসে মারা যায়। সে ভাবে তার কর্মক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণের ফলে অনেক পাপ জমা হয়েছে। এই পাপের শাস্তি দিতেই তার পুত্রকে কেড়ে নিয়েছে স্রষ্টা। সে বলে- 'জীবনে অনেক পাপ করেছি ভাই, আমার পাপ্পুটা জন্ডিসে মারা গেল আমার কাছে আর ঘুষ টুস নিয়ে এসো না'। মুশতাক আহামেদ ঘুমে জাগরণে তার মৃত ছেলে দেখে এবং বিভিন্ন কল্পনার জাল বিস্তার করে। গাড়ি থেকে নেমে সে দেখে তার মৃত ছেলে ল্যাম্পপোস্টের নিচে ডাস্টবিনে পড়ে আছে। –'কি অদ্ভুত হলুদ তার রঙ, যেন বা জন্ডিসে আক্রান্ত, ময়লার স্তুপে তার অর্ধেক পা ঠেসে গেছে।' তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুরা তাকে পাগল বলে আখ্যা দেয়। হতাশা ও পাপবোধের থেকে বিবিক্তি ও নৈঃসঙ্গ্য তাকে অসুস্থ করে তোলে। পরাবাস্তববাদী কল্পনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে 'ল্যাম্পপোস্টের নিচে' গল্পটি। ডাস্টবিনে পড়ে থাকা লাশ ও কুকুরের সংলাপধর্মী বর্ণনা গল্পটিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।

'পুরুষ' গল্পে একজন পঙ্গু যুবকের সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'পুরুষ' গল্পে ফ্রয়োডিয় মনোবিকলন ও লিবিডোচেতনার প্রভাব সুস্পষ্ট। গল্পে পঙ্গু বুলুকে রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দানে পরিবারের লোকদের অনীহা বুলুকে ক্রোধান্ধ করে তোলে। দুই পা পঙ্গু এই যুবককে তার পরিবারের লোকেরা খোকা করে করে ডাকে। তাই তার বোন শেলী তার সামনে কামিজ উঠিয়ে পাজামার ফিতে বাঁধে। বুলুর সামনে সে প্রেমিকের মুখে মুখ সিধিয়ে দেয়। বুলু তার বোনকে অপ্রস্তুত করতে অনেক কাষ্টে দরজার কাছে এগিয়ে এলে শেলী বলে– 'ও বুলু কিচ্ছু অইব না, বলে সে নির্লজ্জের মতো তার মুখ দিয়ে পাটশালার মতো ছেলেটাকে ঢেকে দেয়।' অন্ধকার রাতে ছোট ঘরটিতে শুয়ে বুলুর ঘুম আসে না। তার ভেতরের রিরংসার উত্তাপ তাকে ভস্মিভূত করে। কামোত্তজনায় উদভ্রান্ত হয়ে সে তার নিজের বোনকেই চেপে ধরে গভীর রাতে। শারীরিক উত্তেজনা তার এতটাই প্রবল হয় যে, 'বুলুর হাতে এখন পশুর শক্তি। মুহূর্তে সে তরুণীর দু'পা ধরে নিচে ফেলে দেয়। একটা চিৎকার। বুলুর মাথায় রক্ত, শরীরে আগুন। ধস্তাধস্তির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় ঘরের মানুষগুলোরও। বুলু সমস্ত রক্ত সম্পর্ক অসম্পর্কের উর্দ্ধে চলে গিয়ে তীব্রভাবে বোঝাতে চায়, সে একজন মানুষ, একজন পুরুষ।'

'বিকার' গল্পে গ্রামীণ দম্পতির দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের হতাশা নিয়ে বাঁচার প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মতি একজন দূর্বলচিত্তের পুরুষ। মতির স্ত্রী তাহেরা তার পৌরুষে সর্বদা আঘাত করে, মতিকে একজন সত্যিকারের সাহসী পুরুষ হিসেবে দেখতে চায়। নাসরীন জাহানের অধিকাংশ গল্পের নারী চরিত্রগুলো পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী উজ্জ্বল ও কর্তৃত্বপরায়ণ। এই কর্তৃত্বপরায়ণতা তাহেরার চরিত্রেও স্পষ্ট। অভাবের সংসারে সে মাটির ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত করে তাঁর স্বামীকে দেয় একটা গাভি কিনতে। কিন্তু মতি গাভি কিনতে গিয়ে চেয়ারম্যানের সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চাপা দেয় এক বৃদ্ধাকে। এতে সেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। পরে গাভি কেনার টাকা বৃদ্ধার বিবাহযোগ্যা মেয়েকে দিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফেরে সে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়ে পলায়নপর মনোবৃত্তি ও নিঃসঙ্গতায় নিপতিত হয়। মগ্নচৈতন্যের গভীরে সে ডুবে যায়, অবাস্তব কল্পনা তাড়া করে ফেরে তাকে। সে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে। –'জোসনার তীব্রতা বাড়ছে। এক চিলতে আলো পড়েছে তাহেরার পায়ে। মতি দেখে বউয়ের এলোমেলো শাড়ি হাটুর উপরে উঠে গেছে। জোসনার চিলতে আলোয় সে পা দুটোকে খুবই মসৃণ এবং চমৎকার দেখাচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে মতির। সে একদৃষ্টে বউয়ের পা দুটো দেখতে থাকে। এক সময় তা হলদে দেখায়। নড়াচড়া করে পাশ ফেরে বউ।

ওর একটা পা আবেশে শাড়ির নিচে গুটিয়ে যায়। এতে আরেকটা পা আরো বেশী উদাম দেখা যায়। ক্রমশ মতির কাছে মনে হয় পা-টা খয়েরি হতে হতে কালো হয়ে যাচ্ছে। মতির মাথা চক্কর খেতে থাকে। সব শেষে মনে হয় পা-টা সবুজ সতেজ বাঁশের মতো। আবার পা-টা নড়ে উঠতেই মতি কাঁপতে থাকে, পা-টা যেন সেই খুনি লোকটার হাতের বাঁশ এবং মতির মাথায় তাহেরা সেটা সজোরে বসিয়ে দিচ্ছে। তাহেরার পা-টা প্রাণপনে চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে মতি।' এই গল্পের মতি চরিত্রটি দূর্বল চিত্তের, ভীরু ও পৌরষহীন। তাকে সব সময় তাড়া করে বেড়ায় মৃত্যুচিন্তা। নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ও দারিদ্রতার দুঃশ্চিন্তা তাকে অন্ধকার রাতে ঘর থেকে বাইরের জগতের দিকে ঠেলে দেয়।

'জনক' গল্পে নারীর স্বকীয় ও স্বাধীন অস্বিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে। সন্তান কেন শুধু পিতৃপরিচয়ে বড় হবে? সন্তান জন্মদানে মায়ের যে ভূমিকা সেটা কেন গৌণই থেকে যাবে? এই মৌল প্রশ্নটি এই গল্পের উপজীব্য বিষয়। গল্পের প্রথম দিকে নায়িকাকে নিঃসঙ্গ, বিকারগ্রস্থ মনে হলেও পরে বোঝা যায় তার গর্ভজাত সন্তান নিয়ে সে কেন এতটা উদ্বিগ্ন। তার গর্ভের অনাগত সন্তান যে তার স্বামী রায়হানের নয় সেটিই তার উদ্বেগের কারণ। রায়হানের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তার জিতু নামের এক ছেলের সঙ্গে প্রেম ছিল। বাকপটু জিতু নায়িকার গর্ভে একটা ভ্রুণ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তারা তিনতলায় নীল সন্ধ্যায় নাতিশীতোষ্ণ ঘরের আরামে ফোমের শয্যায় মিলেছিল আদিম আসঙ্গ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে। ভ্রুণ উৎপাদনের জন্য সময়টি ছিল উৎকর্ষিত ও উর্বর। জনক গল্পের নায়িকা গর্ভে সন্তান নিয়ে নিরন্তর যুদ্ধ করে চলেছে নিজের সঙ্গে। চেতন-অবচেতন মনে সে তার অনাগত সন্তান সম্পর্কে কখনো নেতিবাচক আবার কখনো ইতিবাচক ভাবনায় নিমগ্ন থেকেছে। তার মনোজগতে অবসাদ ও দুঃশ্চিন্তা তাঁকে ক্রমশ অসুস্থ করে তোলে। তার ভেতরে ভয় ও সংস্কার দানা বেঁধে ওঠে। –'পেটে সন্তান নয় ডাকিনী পুষেছি। যে কোন সময় পেট ফুড়ে দীর্ঘ হাত-পা বেরিয়ে আসবে। মধ্যরাতে হুবহু সেই দৃশ্য দেখি। শিশু ডাকিনী বেরিয়ে এসেছে কি বিশাল দাঁত কালো রক্ত। পুরো হাসপাতাল মাথায় নিয়ে দাড়িয়ে আছে সে।' অনাগত সন্তান সম্পর্কে এ ধরণের ভাবনা কেবল বিকারগ্রস্ত নারীরাই করতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তাঁর এ ভাবনা সন্তানের পিতৃপরিচয়ের জন্য। সে নিশ্চিত যে তার পেটের সন্তান জিতুরই কিন্তু সে বেড়ে উঠবে রায়হানের পিতৃপরিচয়ে। সরলচিত্ত রায়হানের সাথে প্রতারণা করতে সে বেদনাবোধ করে। রায়হান জানে না তাঁর স্ত্রীর গর্ভের সন্তান তাঁর ঔরসজাত নয়। রায়হানের স্ত্রী যখন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাভূত হয় তখন সে মনে করে সব সত্য স্বামীর নিকট প্রকাশ করে দেবে। কিন্তু পারে না। তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয় যে,

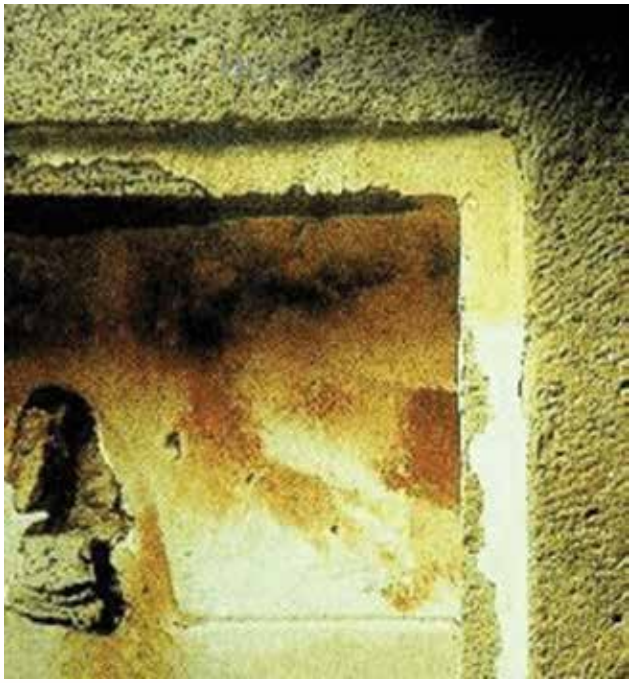

বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যদি সন্তানটি সত্যিই রায়হানের হয়। হঠাৎ তার বোধোদয় হয় যে, অনাগত শিশুটির পিতা জিতু কিংবা রায়হান যেই হোক শিশুটিতো তার পরিচয়েই বড় হতে পারে। –'জিতু নয়, রায়হান নয়, শিশুটির একমাত্র জনক হিসেবে এক সময় আমি নিজেকে চিহ্নিত করি'।

'আমাকে আসলে কেমন দেখায়' গল্পে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একজন নারীর মনোজগতের করুণ আর্তি পাঠককে মর্মাহত করে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যর্থতা তাঁকে কঠিন বাস্তববাদী করে তোলে। তার স্বপ্নদেখা, স্বপ্নভঙ্গের হতাশা, তার দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব আমরা বেদনার্ত হই। যখন সে বলে– 'অনেক খুঁজেছি চাকরি। মাকড়সার গল্প পড়েছিলাম। কিভাবে বারংবার চেষ্টা করে দালানের মাথায় ওঠার অধ্যাবসয়ে জয়ী হয়েছিল। নিজের জীবনে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়োগ ঘটিয়েছি।' সংগ্রামী এই নারীর চিত্রকল্প অত্যন্ত নিখুঁত ও বাস্তবধর্মী; এ নারী যেন আমার বাড়ির পাশের জীবিকার জন্য সংগ্রামরত অতিপরিচিত মুখ। কিন্তু গল্পের শেষের দিকে সে যখন তাঁর ব্যাগ থেকে চুরি করা ঘড়িটি লোকটাকে দিয়ে দেয় তখন আমরা কিছুটা বিভ্রান্ত হই। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত জীবনে আর কোন গোত্রান্তর মেয়েটির ছিল না। অভাব অনটনের সংসারে নিত্যদিনের অন্নসংস্থান যখন ভদ্রভাবে হয় না তখন বর্ণচোরা হয়েই বেঁচে থাকতে হবে। শঠতা, প্রবঞ্চনা, চৌর্যবৃত্তি যার জীবন চালিকার মাধ্যম তাকে তো পোশাক ও দেহ সচেতন হতেই হয়। একারণেই মেয়েটির মনের মধ্যে নিয়ত সঞ্চরণশীল থাকে যে 'আমাকে আসলে কেমন দেখায়।'

'ঈর্ষা' গল্পে দারিদ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। মা ও মেয়ে

দু'জনই সন্তানসম্ভবা। ভরপেট নিয়ে মেয়ের সেবা করতে এসেছে মা। হিরু তার দারিদ্রের সংসারে কর্তৃত্বপরায়ন নারী হিসেবে আবির্ভূত। সে তার স্বামী চাঁদকে একজন সুপুরুষ হিসেবে দেখতে চায়। স্বামীর কোমল স্বভাব সংসার থেকে পলায়নপর মনোবৃত্তি হিরুকে স্বামীর প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে। নিত্যদিনের অভাবের সাথে সংগ্রাম করে তাদের টিকে থাকতে হয়। এর মধ্যে তাদের সংসারে আসছে অনাগত সন্তান। যার দায়িত্ব চাঁদ নিতে চায় না আবার অস্বীকারও করতে পারে না। এই দারিদ্রতার মাঝে হাজির হয় হিরুর মা। যে নিজে গর্ভবতী। তারও এখন তখন অবস্থা। হিরু যখন সন্তান জন্মদানের ব্যথায় ছটফট করছে চাঁদ তখন দূরে গাছে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর এক দুর্ণিবার টানে চাঁদ এসে ঘরের দরজায় হাজির হয়। হিরু রক্তস্রোতে ভাসতে থাকা শিশুটিকে চাঁদের হাতে তুলে দেয়। এই দৃশ্য দেখে হিরুর মায়ের হিরুর প্রতি ঈর্ষা জাগে। –'নিজের ভরন্ত পেটের দিকে চেয়ে সে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠে, পরক্ষণেই হিরুর উদ্ভাসিত মুখ দেখে ঝা ঝা করে ওঠে বুক। সে কাঁদতে থাকে, হিরুরে হিরু তোর তো মাথার উপর স্বামী আছে; আমার কি হবে রে হিরু।' গল্পটি বাংলাদেশের গ্রামীণ পটভূমিকায় অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক ও জীবনঘনিষ্ঠ। আমাদের গ্রামীণ সমাজে শত দারিদ্রতার মাঝেও মা ও মেয়ে একসঙ্গে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। লেখক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই দৃশ্যকেই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'শিবমন্দির' গল্পে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত কাদের আলী জগৎ সংসার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। হঠাৎ করেই একদিন চির অশান্তির খাই খাই সংসারকে পেছন ফেলে বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। এমতাবস্থায় তার মনে পড়ে গ্রামের সেই শিবমন্দিরটির কথা। যাকে ঘিরে অনেকদিন থেকেই বহু কিংবদন্তি মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরছে। পুরণো, ক্ষয়িষ্ণু শিবমন্দিরে বাস করে দু'টি সাপ। আর মন্দিরের মাঝে আছে বহু কাঙ্ক্ষিত সোনার হাড়ি। কাদের আলীর সামনে একদিকে সোনার হাড়ি হস্তগত হবার সুযোগ ও মৃত্যুভয় অন্যদিকে দারিদ্রের নিষ্ঠুর পেষণ; কোনটি বেছে নেবে সে। মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে সে ঢুকে পড়ে শিবমন্দিরে। ভয়, শঙ্কা, উৎকণ্ঠা নিয়ে কাদের আলীর একটি রাত কাটে। শিবমন্দিরে সোনার হাড়ির গল্প গল্পই থেকে যায়। একটি রহস্যময় রাত নির্জন শিবমন্দিরে কাটিয়ে কাদের আলী সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা পায়।

'কাঁটাতার' গল্পে লেখকের নারীবাদী মনোভঙ্গি লক্ষ্যযোগ্য। গল্পে সামাজিক অবক্ষয় ক্লেদ ও পুরষতান্ত্রিকতার দূর্বৃত্তায়ন সুস্পষ্ট। এই গল্পের নায়িকা কুন্তলা শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী। মণ মণ ধান মাথায় নিয়ে সে হাটতে পারে। তাঁর স্বামী মাধব ভিন্ন গ্রামে কামলা খাটে। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে। বৃদ্ধা শাশুড়িকে নিয়ে কুন্তলা বাড়িতে থাকে। একদিন রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বের হলে কয়েকজন ছায়ামূর্তি মাঠের মধ্যে কুন্তলাকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর ওপরে চালায় পালাক্রমিক ধর্ষণ। ধর্ষণের ফলে গর্ভপাত। মোটামুটি একটি পরিণত মৃত শিশুর জন্ম। এতে করে কুন্তলার বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু তার পুরুষালী শক্তিসামর্থের কারণে মারাত্মক অসুস্থ হয়েও এ যাত্রা বেঁচে যায়। মৃতপ্রায় কুন্তলা শরীরের সঞ্চিত শেষ শক্তিটুকু ব্যবহার করে তাঁর সেই পরিচিত ঘরের দরজায় পা বাড়াতেই– 'ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধা বিশাল আকৃতি নিয়ে দরজার সমস্ত ফুটো বন্ধ করে টানটান দাঁড়ায়।' এই গল্পে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ষণের পর নারীর সামাজিক অবস্থান সংকুচিত হয়ে যায়। ধর্ষকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও তার শাস্তি নিশ্চিত না করে আমাদের সমাজ ধর্ষিতার প্রতি সমস্ত দায় ও ঘৃণা প্রকাশ করে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ধর্ষণের ঘটনা অপ্রকাশিতই থেকে যায়। কুন্তলার শাশুড়ির আচরণে আমাদের সমাজের মানুষের মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

নাসরীন জাহানের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল ও লোমহর্ষক কাহিনীর গল্প 'দাহ'। এ গল্পে গ্রামীণ সমাজপতিদের আধিপত্য বিস্তার ও রেশারেশির বলি হয় তালুকদারের কৃষাণ হাফিজ। তালুকদারের ধানের ঘরে আগুন লাগলে আগুনে পুড়ে মারাত্মক জখম হয় হাফিজ। তালুকদারের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতার জন্য খাঁ বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদের ফাঁসিয়ে দিতে চায়। আর সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করতে চায় হাফিজকে। –'তুই সামনের বিশ্যুদবার আমার লগে কোর্টে যাইবি। তুই বইলবি তুই নিজের চোখে দেখছস ....। পারমু না, প্রায় চিৎকার করে বলে উঠে হাফিজ।' হাফিজ বুঝতে পারে তালুকদার তাঁকে মরতে দেবে না আবার বাঁচতেও দেবে না। তাঁর শ্যালক আবুকে সঙ্গে করে তালুকদারের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সে। অগ্নিদগ্ধ হাফিজ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, তাঁর শালা তাঁকে পথের মধ্যে রেখে চলে যায়। হাফিজের পথ আর শেষ হয় না। আবু চলে যাওয়াই তীব্র মানসিক কষ্টে ভোগে হাফিজ। তাঁর বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। -'তার শরীরের ক্ষতগুলো এমনভাবে জ্বলতে থাকে যে, ওর শরীরটা কেউ ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে ফেলেছে।' সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যখন একটি কুকুর এসে হাফিজুরের অগ্নিদগ্ধ পা চাটতে থাকে। শুরু হয় মনুষ্য জীবন নিয়ে কুকুর মানুষে টানাটানি। গল্পটিতে সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক মূল্যবোধহীনতা ও ব্যক্তিচৈতন্যের বৈনাশিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

উত্তম পুরুষে বর্ণিত 'আব্বা আম্মা আর খালাম্মা'র গল্পে লিবিডো চেতনা বা প্রবল যৌন আকাঙ্ক্ষার নিকট ব্যক্তির শুভবোধের পরাভবতার প্রকাশ ঘটেছে। স্বামী পরিত্যাক্ত নিঃসঙ্গ একজন নারীর প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা ও বোনের স্বামীর সঙ্গে যৌনকর্মে মিলিত হওয়া অনিবার্য কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। খালাম্মা ও আব্বার যৌনমিলনের সাক্ষী পুত্রের নিকট পিতার 'কনফেশনস'

তত্ত্বভারাক্রান্ত করেছে গল্পটিকে। যা গল্পটির সফলতা দানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

নাসরীন জাহানের অধিকাংশ গল্পে আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অসীম নৈঃসঙ্গ্যচেতনা যা ব্যক্তিকে মানব সমাজের মূলস্রোত-ধারা থেকে বিভক্ত করে ফেলে। উপরোল্লিখিত অধিকাংশ গল্পের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি, প্রায় সকলেই নিঃসঙ্গ অথবা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। নাসরীন জাহানের গল্পের চরিত্রগুলোর বিভিন্নমুখী বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– পরিবার বিচ্ছিন্নতা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, প্রেম বিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধ বিচ্ছিন্নতা, সত্তা বিচ্ছিন্নতা -এসব বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিচৈতন্যে সৃষ্টি করে নৈঃসঙ্গ্যের উপলব্ধি।'[১১] নাসরীন জাহানের ছোটগল্পের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য দারিদ্র্য। তিনি দারিদ্রপীড়িত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে অধিক আগ্রহী। তাঁর অনেক গল্পের চরিত্রই দারিদ্রের কারণে অসহায় ও নিঃসঙ্গতায় ভোগে। জীবন সংসার থেকে পলায়নপর

মনোবৃত্তি তাঁর গল্পের চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিঃসঙ্গতার অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানুষ সংলগ্ন হতে চায় বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে।[১২] তাঁর ছোটগল্পে নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। তার অধিকাংশ গল্পই শেষ হয়েছে ক্ষয়িষ্ণু, অপচয়িত, পলায়নপর, নিঃসঙ্গ, দারিদ্রপীড়িত জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। যা পাঠককে আশাবাদী করে তোলে। নাসরীন জাহানের ছোটগল্প বিশ্লেষণ শেষে একথা বলা যায় যে, তাঁর লক্ষ্য অবচেতনার বাস্তবচিত্র আঁকা নয় কিংবা অবচেতনার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে কল্পনার জগৎ সৃষ্টিও নয়। তার লক্ষ্য হ'ল চেতন ও অবচেতন, অন্তর ও বহির্জগতের মধ্যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বেড় ভেঙ্গে দেওয়া।[১৩] এ কারণেই তার গল্পের চরিত্ররা অতি সাধারণ হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্টমণ্ডিত ও স্বাতন্ত্রিক।

**তথ্যসূত্র**


১। মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ' (১৯৫০-৭২), প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃষ্ঠা নয়, ভূমিকাংশ

২। সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন: স্বরূপ উন্মোচন', ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, একচল্লিশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা। কার্তিক ১৪০৪ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৭, ৮

৩। আজাহার ইসলাম, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য', প্রথম প্রকাশ জুন- ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৩৪৬

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৭৯

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৪১

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৭১

৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৮০

৮। মো. রবিউল হোসেন, 'দিলারা হাশেমের ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা', ভাষা সাহিত্য পত্র, ত্রয়বিংশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৪, সম্পাদনা ডা. পৃথ্বিলা নাজনীন, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ১৬৭

৯। সরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন: স্বরূপ উন্মোচন', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৮

১০। বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ' প্রথম প্রকাশ- জুন- ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২৮

১১। বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৯

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৫

১৩। রোখসানা চৌধুরী, 'জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস বিষয়বস্তু ও প্রকরণ', মওলা ব্রাদ্রার্স- ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২৯



মঈনুল ইসলাম: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# বাংলা প্রবাদ-প্রবচন: সমাজ বাস্তবতার সেকাল-একাল

মো. খেজমত আলি মালিথ্যা

প্রবাদ-প্রবচন মূলত আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। প্রবাদ মানুষের সাধারণ চেতনা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি সত্যভাষণ। দীর্ঘব্যক্তিক অভিজ্ঞতা দৈনন্দিন ব্যাপারে সংঘটিত ঘটনাসমূহ থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং চিরন্তন সত্যের ছন্দমাধুর্যময় কাব্যিক প্রকাশ, যা লোকমনে বিস্তার লাভ করে, ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং স্থান-কাল-পাত্র পারিপার্শ্ব উপযোগী হলে কথাচ্ছলে স্বত্বই যা লোকে ব্যবহার করে তাই প্রবাদ। প্রবচন হচ্ছে নীতিকথামূলক বা উপদেশমূলক সুবচন, যাতে স্পষ্টত হিতোপদেশ, প্রকৃষ্ট বচন বা প্রীতিময় কথাগুচ্ছের সাহায্যে শ্রোতাকে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠককে মুগ্ধ করার চেষ্টা থাকে।

প্রবাদ-প্রবচন সাহিত্যের এবং সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন। এসকল প্রবাদ-প্রবচন থেকে আমরা আমাদের সমাজের সেকাল এবং একালের একটি চিত্র পেয়ে থাকি। যেহেতু, প্রবাদ-প্রবচন ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীরতম অনুভূতি থেকে উৎপন্ন সেহেতু প্রবাদ-প্রবচনের ভাষণ সমাজের সত্য ভাষণ। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককালের মানুষ তাদের জীবন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলেছে অথবা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককালের সাহিত্যেও প্রবাদ-প্রবচনের কদর লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদে এমন কিছু প্রবাদ-প্রবচনের দেখা পায় যা সমাজ বাস্তবতার চির সত্য হিসেবে প্রমাণিত। যেমন-

- 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী' অর্থাৎ হরিণ তার নিজের সুস্বাদু মাংস এবং সৌন্দর্যের জন্য নিজেই নিজের শত্রু।
- দুহিল দুগ্ধ কি বেন্টে যামাহ। অর্থাৎ বাট থেকে দোহান দুধকে আর পুনরায় বাটে প্রবেশ করানো যায় না।
- হাঁড়িতো ভাত নাহি নিতি আবেশী। অর্থাৎ হাঁড়িতে ভাত নেই তবু প্রতিদিন অতিথি আসে।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকেও আমরা বেশ কিছু প্রবাদ-প্রবচনের উদাহরণ নিতে পারি। যেমন-
  - ললাট লিখিত খণ্ডন না জা-এ।
  - দেখিলা পাকিল বেল গাছের ওপরে।

    আর তিল কাক তার ভখিতেঁ না পারে।
  - নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
  - হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

এসকল প্রবাদে তৎকালীন সমাজের যে চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে তা বর্তমান কালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও আমরা একই প্রবাদ প্রবচনের অহরহ ব্যবহার করি।

প্রবাদ-প্রবচনের জন্য আমাদের সবসময় সাহিত্যপাঠের প্রয়োজন হয় না। প্রবাদ-প্রবচনের সবচেয়ে বেশি প্রসার এবং প্রয়োগ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। সাধারণ মানুষ তাদের জীবনাভিজ্ঞতায় এসকল প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে কখন হাস্যরসাত্মকভাবে, কখন তীক্ষ্ণকটাক্ষের মাধ্যমে সমাজের নানা অবস্থা বর্ণনা করে থাকে। আমরা সমাজে প্রচলিত এমন কিছু প্রবাদ-প্রবচনকে এখানে তুলে ধরবো। যেমন এক অভাগা চোর স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে চুরি করতে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে এসে স্ত্রীর কৈফিয়তে জবাব দেয় সমাজের সাধারণ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের হঠাৎ উত্থান দেখে আপনার এ প্রদাদটির কথা মনে পড়বেই পড়বে– আমার গাছের কলা নিয়ে দশসুদ্ধ কলা আমার ছেলে কেঁদে বেড়ায় বাবা কলা কলা।

তাছাড়া আমরা আমাদের নিজেদের অসহায়ত্ব অথবা অন্যের ভণ্ডামি বোঝাতে প্রায়ই এই প্রবাদগুলো ব্যবহার করে থাকি। যেমন-

* আমিও ফকির হলেম, দেশেও আকাল এলো;
* আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর রেখে লাভ কি;
* কুকুরের লেজে ঘি দিলেও সোজা হয় না;
* চোরে চোরে মাসতুতো ভাই;
* ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।

"অভাগা চোর যে বাড়ি যায়, হয় কুকুর ডাকে না হয় রাত পোহায়"

অথবা সেই মুখরা রমণীর গল্প। একবার কীর্তন শুনতে গিয়ে বসার জায়গা নিয়ে ঝগড়া করে অন্য মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিল, ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন তবে ঘরে বসে কীর্তন শুনব"

প্রতিটি প্রবাদের পিছনে রয়েছে একটি করে জীবনের গল্প, হতে পারে সেটি মধুর বা কষ্টের। সমাজের সেই সুখ দুঃখের সেই চিত্রগুলো প্রবাদ-প্রবচনে আমাদের চেতনায় আঘাত করে, আমাদের সচেতন করে তোলে এবং সমাজ ও ব্যক্তি মানুষকে বুঝতে নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন- হঠাৎ আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়া মানুষদের আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত দেখি, এরা নিজেদের অতীতকে লুকিয়ে বর্তমানকে প্রকাশ করতে চায়। তখন স্বভাবতই আমাদের এই প্রবাদটি মনে পড়ে "নিত্য চাষার ঝি, বেগুন ক্ষেত দেখে বলে এ আবার কী?"

স্বভাব যে বদলায় না, যে, যে অবস্থার লোক সে, সে অবস্থার উপযোগী বস্তুকেই মূল্যবান মনে করে। এ অবস্থা বোঝাতে প্রায়ই এ প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়-

'লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা'

অর্থাৎ লঙ্কা থেকে মণি-মুক্ত আনতে না পারলেও দরিদ্র রমণী লঙ্কা থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় হলুদ আনলেন।

আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা বুঝাতে এই প্রবাদগুলোকে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। যেমন- এক বড়লোক নদী পার হওয়ার সময় মুহুরির মেপে দেয়া পানির গড় হিসেবে পার হতে গিয়ে দেখেন ছেলে ভেসে যাচ্ছে। তখন সে বলে, "লেখা যোখায় ভুল নাই, ছেলে কেন ভাসে?"

আমাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি রাজনীতির সব হিসাব ঠিক থাকলেও আমরা প্রতিনিয়ত কেন হতাশায় ডুবে যাচ্ছি আমরা এ

প্রবাদ থেকে বুঝতে পারি। যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত আমাদের কপালই যে ভরসা চন্ডিচরণ ও রামাচরণের সেই গল্প থেকে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। যেখানে লেখাপড়া জানা চন্ডির লেখাপড়া না শিখে বড়লোক হয়ে যাওয়া ভাই রামাচরণকে দেখে উপলব্ধি হয়েছে- লেখা পড়া যেমন-তেমন কপাল মাত্র গোড়া, চণ্ডিচরণ ঘুটে কুড়োয় রামা চড়ে ঘোড়া।

প্রবাদ-প্রবচন সমাজের দর্পণ। আমাদের সমাজকে জানতে হলে, বুঝতে হলে, প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্য অবশ্যয় নিতে হবে। বর্তমান প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন হাজারো রঙিন বিষয়বস্তুর আড়ালে আমাদের জাতীয় সম্পদ প্রবাদ-প্রবচন যেন হারিয়ে না যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের ছেলে-মেয়েদের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্যের গল্প শোনাতে হবে যা কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতাই, শ্রমে মোড়ানো প্রবাদ-প্রবচনে সমৃদ্ধ।

মো. খেজমত আলি মালিথ্যা: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

দু'একটি বিষণ্ন ঝিঁঝিঁ ছাড়া আরকোনো গান নেই, শব্দ নেই, জীবনের শিল্প নেই, নেই কোনো প্রাণের সঞ্চার। এ শহর অন্ধ করে তুমি চলে যাচ্ছো অন্য এক দূরের নগরে, আমি সেই নগরীর কাল্পনিক কিছু আলো চোখে মেখে নিয়ে তোমার গন্তব্যের দিকে, নীলিমায় তাকিয়ে রয়েছি।

নির্মলেন্দু গুণ

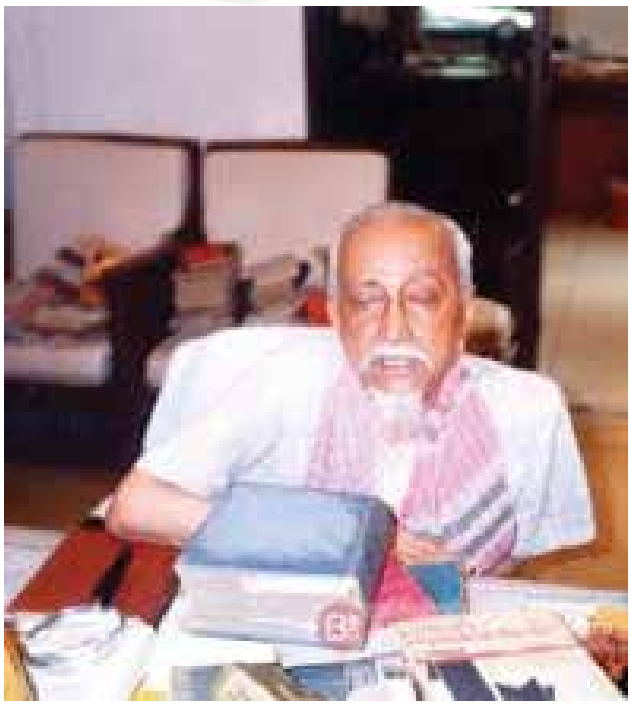

# বাঙালির চিন্তাজগতের ত্রয়ী নক্ষত্র

বশির আহাম্মেদ

সেদিন ছিল শনিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কলেজ ক্যাম্পাসের ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে বিভাগের দিকে হাঁটছি। কোলাহলহীন ছুটির দিনগুলোয় বিশেষ কাজ না-থাকলে প্রায়ই কলেজে চলে আসি। ঝরাপাতাগুলো কার্পেটের মতো করে বিছানো আছে পুরো বৈশাখী চত্বরে। ছুটির দিনেও কিছু শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে আসে। ছুটির দিনগুলোয় ওরাও আমার মত ক্যাম্পাসে আসে গল্প করতে কিংবা পরামর্শ নিতে। কারণে আসে আবার অকারণেও আসে। ভালোলাগা থেকে আসে আবার বিরক্তি নিয়েও আসে। এ এক অন্যরকম ব্যাপার। তাদের আসতেই হয়, যেমন আমাকে আসতে হয়। যাই হোক ভাবলাম বৈশাখী চত্বরে একটু বসি।

স্নিগ্ধ সকালে মুগ্ধতা ছড়ানো প্রিয় বৈশাখী চত্বরে বসে আকাশ দেখতে খুব ভাল লাগে, ভাল লাগে মেহগনি গাছের পাতার ভাঁজে ভাঁজে পাখিদের লুকোচুরি দেখতে। সেদিনও আমি তাই দেখছি আর ভাবছি বৈশাখী চত্বর বানানোর সময় আর গল্পটা নিয়ে। খুব বেশিদিন নয়, মাত্র ৫/৬ বছর হবে এটা বানানো হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডের কথা কল্পনা করে ওই একই আদলে মেহেরপুর সরকারি কলেজের বৈশাখী চত্বর তৈরি। এই চত্বরটি এখন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় আড্ডাস্থল, কেউ কেউ পড়াশোনাও করে। আর ছুটির দিনে শিক্ষকরাও এখানে বসে, গল্প করে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-ক্যারিয়ার নিয়ে আড্ডা দেয়।

গরম পড়তে শুরু করেছে। বৈশাখী চত্বর পেরিয়ে একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দ্বাররক্ষক তালা খোলার পর তৃতীয় তলায় উঠে দেখলাম নিরব করিডোরে ফুলের টবগুলো পানির জন্য হাহাকার করছে। চারপাশটা দেখে অফিস কক্ষের দিকে পা বাড়ালাম। প্রথম ক্লাসরুমটি সামনে পড়লো। বিভাগীয় প্রধান আবদুল্লাহ আল-আমিন প্রত্যেকটি রুমের নামকরণ করেছেন বাঙালি রাষ্ট্রচিন্তকদের নামে।

প্রথম শ্রেণিকক্ষটি জাতীয় অধ্যাপক জ্ঞানতাপস প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক স্যারের নামে। তাঁকে বলা হয় শিক্ষকদের শিক্ষক। আমৃত্যু জ্ঞানসাধনাই ছিল তাঁর পরমব্রত। তিনি জ্ঞানের কথা বলে সবাইকে মুগ্ধ করতেন। প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিশ যেমন তরুণদেরকে জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতেন, রাজ্জাক স্যারও তাই করতেন। জ্ঞানের অনিবার্য টানে তাঁর কাছে ছুটে যেতেন সরদার ফজলুল করিম, আহমদ ছফা, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। আড্ডার ছলে তিনি জ্ঞান বিলাতেন। দেশি বিদেশি প্রচুর বই তিনি পড়তেন এবং সেগুলো সংগ্রহে রাখতেন। জ্ঞানের সকল শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। ভালো হোক, মন্দ হোক রাজ্জাক স্যার সবাইকে জ্ঞানের পরিধিতে ঠাঁই দিতেন। যারা জ্ঞানী, তাঁদের তিনি কাছে ডাকতেন। তিনি সমালোচনার ধার ধারতেন না। প্রফেসর আনিসুজ্জামানের ভাষায়, 'রাজ্জাক স্যার হচ্ছেন সূর্যের মতো, যেখানে দরকার সেখানে আলো ফেলতেন আবার যেখানে দরকার নাই সেখানেও আলো ফেলতেন।' রাজনৈতিকভাবে রাজ্জাক স্যার মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমর্থক ছিলেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বলতেন, পাকিস্তান হলে পূর্ববঙ্গ একদিন স্বাধীন হবেই। অন্য কারো সাথে গেলে সেটা সম্ভব হবে না। দিন শেষে তাঁর কথাই কিন্তু সত্যি হয়। যাই হোক রাজ্জাক স্যার ছিলেন সদা দীপ্তিমান সূর্য। তাঁর চিন্তা ও দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ ও আজকের বাংলাদেশ। এই অজেয় অমর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অবশ্যই বাংলাদেশ চিরদিন মনে রাখবে ।

তারপর অফিসে প্রবেশ না করে গেলাম দ্বিতীয় শ্রেণিকক্ষটির দিকে। এটি সরদার ফজলুল করিম স্যারের নামে। তিসি

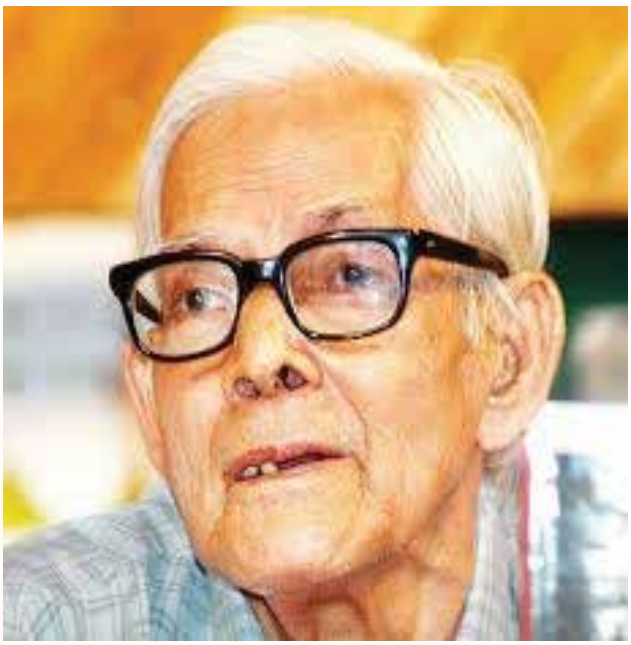

একজন বিপ্লবী দার্শনিক এবং স্বপ্ন দেখতেন একটি শোষণহীন সমাজের। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের পদ ছেড়ে বিপ্লবী চেতনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, জেল খেটেছেন, শোষণের প্রতিবাদে অনশন করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাম্যবাদী চেতনায় নিবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে যেমন সাম্যবাদী চেতনায়

উদ্বুদ্ধ ছিলেন তেমনি তার ছাত্রদের মধ্যেও সাম্যবাদী চেতনা বিতরণ করতেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর অনূদিত চিরায়ত গ্রিকদর্শনের অমূল্য গ্রন্থগুলো শিক্ষার্থী ও পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে, বিশেষত *প্লেটোর সংলাপ*, *প্লেটোর রিপাবলিক*, *এরিস্টটলের পলিটিক্স*, *এঙ্গেলসের এন্টি ডুরিং* প্রভৃতি গ্রন্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। তাঁর মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। দর্শনকোষ, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ', সেই সেকাল ইত্যাদি গ্রন্থগুলো জ্ঞান জগৎকে অভাবনীয়ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক স্যারের শিষ্য ছিলেন। রাজ্জাক স্যারের আগ্রহে তিনি স্বাধীনতার পর দর্শন বিভাগ ছেড়ে ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। রাজ্জাক স্যার বিশ্বাস করতেন দর্শন ছাড়া রজিনীতি সম্ভব নয়। সরদার ফজলুল করিম গর্ব করে এসব বলে বেড়াতেন। সরকার ফজলুর করিম পরিণত বয়সে বিদায় নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান আদর্শ, দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তাঁর আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম যুগে যুগে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে ।

এবার সর্বশেষ শ্রেণিকক্ষটির দিকে পা বাড়ালাম। এটিকে কনফারেন্স রুম করা হয়েছে। এই কক্ষে ক্লাস নেওয়া হয় আবার ছোটখাট মিটিংও করা হয়। কম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানও করা হয়। আবার ছাত্রছাত্রীরা বসে পড়তেও পারে। এই কক্ষটিকে বহুমাত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী স্যারের নামে এর নামকরণ করা হয়।

তিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর অবদান অনেক। তিনি রাজনীতিতে শক্তিশালী বিরোধীদলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বক্তব্য দিতেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির বড় মাপের সংগঠক ছিলেন। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে শক্তিশালী রাজনীতি, শক্তিশালী বিরোধী দল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমি শ্রদ্ধেয় স্যারদের মুখে তাঁর গল্প শুনেছি। তাঁকে সবাই 'ম্যাক স্যার' বলে সম্বোধন করতেন।

তখনো অফিসে ঢুকিনি। বারান্দায় পায়চারি করছি। ইতোমধ্যে দু'জন শিক্ষার্থী বিভাগে এসেছে, প্রথমেই বলেছিলাম তারা প্রয়োজনেও আসে আবার অপ্রয়োজনেও আসে, এসেই তারা ডিপার্টমেন্টের বারান্দা বাগানের পরিচর্যা করতে শুরু করে। তাদের স্পর্শে গাছগুলো সজীব হয়ে ওঠে, প্রাণ ফিরে পাই, সেই আনন্দ-ভাবনা নিয়ে আমি অফিসে প্রবেশ করি।

বশির আহাম্মেদ: সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# সমুদ্রের গান

মহা. আব্দুর রাজ্জাক

বীতনীড়, সানুশয় সংগ্রাম
কেউ দেয়নি তোমার দাম
আমি কি সমানে সমান
ক্ষমা চাই–
আসুক যে বদনাম
তবু তা গর্ব সালাম
জানি তা জনোমো জনোম
মানি তা মর্ম আয়াম ॥

ধন্য বলি সেই বরণ ডালি
প্রতি প্রত্যাহার তার সূচনাবলী
আজো তা ভাবি সতত জুহি
বহে গঙ্গা - সে চাওয়া রহি
সুবো-শাম
ছাবি নাম
কাবি অশ্রুত বনাম ॥

ওই পদ্মা, এই মেঘনা
জানে যমুনা
তপোকন্যা, ও অপর্ণা
সবার তা জানা।
শত বরোষা
দেয় পরশা
লাখো লাখো ক্ষণ
পাই ভরসা
অখিলম, আঁখিয়ম
অনন্ত প্রণাম ॥

জোহন কাহন, তোমার জীবন
নামাহন তন, বাহার আনন
পথো-প্রান্তর-মাঠ
ফুল ফসল বিরাট
নগর-পুর-ধাম
ছোট বড় গ্রাম
ছায়া সুনিবিড়

শান্তির নীড়
হ্যাঁউ, এ অর্ণাবাকুল
ঊর্মি দোদুল
তাহতা তাহু
জালজা জাহু
হু-হাওয়া-হু
বাওতা বাহু
অসহম বিকহম
বিবিক্ত জাহাম ॥
দহি সহি জীবন বাহি
কেউ বলে না, অমর জাহি
কোটি কোটি শম্পা
পড়ে নিতি আচমকা
কত ঝঞ্ঝা আবর্ত
হই নিতি আহত।
শত বিষিত ধৌত
পড়ে তা-গুণ-তা শত
হাজার বিলয় বর্জ্যভার
সাথে সমর অত্যাচার
দিন হয় না অবসান
ক্ষণ সাবনের সমান।
কাল কতই যে গেল
জানে বিধাতায় ভালো।
এই লো অন লে অবন
যেন হয় না কার জীবন
আহাম তৃষাহম, অশান্ত হিয়াম ॥

মহা. আব্দুর রাজ্জাক: অধ্যাপক ও প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

## আশ্রয়

মো. মনিরুজ্জামান

নিঃশব্দে বসে আমি ভাবি তোমায়,
কত গভীরে প্রোথিত তোমার ভালোবাসা,
শীতল বাতাসে বয়ে যায় আমার সকল কষ্ট,
তোমার স্পর্শে মুছে যায় সব ব্যথা, সব নষ্ট।

নিঃস্ব হওয়া এই মনটি পায় নতুন প্রাণ,
তোমার মধুর কথামালা, চাইনা এর অবসান।
প্রতিটি স্পন্দনে আছে তোমার স্মৃতি,
প্রতিটি নিশ্বাসে অনুভব করি তোমার প্রীতি।

চাঁদের আলোয় ভরে যায় এই পৃথিবী,
তেমনি তোমার ভালোবাসায় ভরে আমার জীবন,
প্রেমের এ বাঁধন কখনো হবে না ক্ষয়,
তোমার ভালোবাসাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

মো. মনিরুজ্জামান: প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

## তুমি আসবে বলে

ফারজানা জুঁই

তুমি আসবে বলে
দখিনা দুয়ার খোলা রেখেছি আজো,
তুমি আসবে বলে
দু-চোখে এখনো জ্বলছে আশার আলো ।
তুমি আসবে বলে
বসন্ত যেন বার বার ফিরে আসে,
তুমি আসবে বলে
ভোরের কোকিল আজও কুহু কুহু ডাকে।
তুমি আসবে বলে
আকাশের বুকে বৃষ্টি করছে খেলা,
তুমি আসবে বলে
ফুলের পাপড়ি ঝরেনি কোন বেলা।
তুমি আসবে বলে
কবিতা লেখার কলম থামিনি আজো,
তুমি আসবে বলে
প্রকৃতি বলে সাত রঙে তুমি সাজো।
তুমি আসবে বলে
চায়ের কাপ থাকেনা কখনো খালি,
তুমি আসবে বলে
জানালায় বসে আমি প্রতিটা প্রহর গুনি।

ফারজানা জুঁই: ছাত্রী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

## সভ্যতার ক্যানসার

মো. রাফি উদ্দিন

আধুনিকতার বিষবাষ্পে র্মমরিত আত্মা
দিকে দিকে বিস্তৃত দিগভ্রান্ত রাজনীতির চোরা ফাঁদ
গ্যাস্ট্রিক আলসারে পোড়া ক্ষত ও বিপন্ন হৃদয় গুমরে ওঠে
দুশ্চিন্তায় ও উদ্বাস্তু জীবনের ভারে ।
রাত্রির নিকষিত অন্ধকারে
পোড়া জীবনের কলঙ্ককে বয়ে নিয়ে চলে বেশ্যাপল্লী ।

হে হাজার বছরের বর্তমান সভ্যতা,
তুমি তো ঘুণেধরা ভীষণ কুৎসিত।
কি দিয়েছ আমায়?
দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠেছে তোমার পোড়া মবিলের
মতো চেহারা।

তুমি কি ফিরিয়ে দিতে পারবে আমার পল্লীর শস্যপ্রান্তরে
বসে পান্তা খাওয়ার প্রশান্তি।
ধবধবে সাদা জীবনের সরলতা; ছোট্ট কুটিরে বসে
অ্যালুমিনিয়াম নয়,
মায়ের হাতের কাঁচের চূড়ির বলয়ের ভিতরে লুকিয়ে
থাকা সহজ স্বপ্নগুলোকে?
যদি না পারো তাহলে দূর হয়ে যাও, চোখের সামনে থেকে।

রমা. রাফি উদ্দিন: ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

## কে এলে

মো. অনিক হাসান

রুমঝুম নূপুর বাজায়ে কে এলে
কে এলে গো সুনয়না মোর দ্বারে
তোমার দু'চরণে নূপুর বরণে
হে প্রিয়া, হেরি তব মুগ্ধ নয়নে।

নূপুরের শব্দে মোর হৃদয়ে লাগিলো যে দোলা
কাঁপিয়া উঠিলো অঙ্গ আজি হৃদয় মম খোলা
আজি সহসা যেন সকল বাঁধা বিঘ্ন অন্ধকার রুদ্ধ
তোমাতে আমাতে জড়িয়া রচিত হইবে মহাকাব্য।

বুঝি নন্দন হতে আজি আসিয়াছো মোর দ্বারে
তোমার আগমনে স্বর্গীয় সুগন্ধি ভরা মোর ঘরে
একি অপরূপ ললিতমোহন তোমার অঙ্গভঙ্গি
মোর জীবনে যাহা পূর্বে কভু কোথাও দেখিনি।

সমল মোর হৃদয় বিমল করিলে তুমি ওগো দীপ্ত
অসীম প্রেমানন্দে বিহ্বল দিশেহারা মোর চিত্ত
নীলাভ শাড়ি অঙ্গে জড়িয়ে বঙ্গনারীর সাজে
সমুখে এলে খোঁপায় হেরি গুচ্ছ পুষ্প গুঁজে।

হে প্রেয়সী তোমার শুভাগমনে আমি আবেগে আপ্লুত
হে কাজল নয়না তোমার রূপের ছাঁটায় আমি আলোকিত
হে নবরূপা তোমার কেশ বাহারীর দোলায় আমি উচ্ছ্বসিত
হে উর্বশী তোমার ছোঁয়ায় মোর হৃদয় অঙ্গন পুলকিত।

মো. অনিক হাসান: স্নাতক পাস, দ্বিতীয় বর্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# তোমার কী মনে পড়ে না

শর্মিলা আক্তার বৃষ্টি

তোমার কী মনে পড়ে না----
সেই সন্ধ্যার কথা,
অঝোর ধারার বৃষ্টির কথা,
মুখোমুখি বসে পরস্পর কী বলেছিলাম তখন আমরা?
তোমার কী মনে পড়ে না,
পুরোনো সেই দিনের কথা,
পাশাপাশি বসে গল্পের বইপড়া,
তোমার নির্লিপ্ত কাব্যিক দৃষ্টি
এলোকেশে ঢেকে যাওয়া তোমার মুখ
তোমার মায়াবী চোখের চাহনি
বন্দি-হওয়া আমাদের সময়,
তোমার কী মনে পড়ে না,
বসন্তের সেই দিনের কথা,
তোমাকে নিয়ে বৈশাখী চত্বরে পাশাপাশি হেঁটে চলার কথা।
তোমার কী মনে পড়ে না,
চায়ের কাপে জমে থাকা ভালবাসা
রিকশা করে যাওয়া আমাদের গল্প
তোমার কী মন খারাপ হয় না, ব্যাথা লাগে না,
কষ্ট হয় না, বলো?

শর্মিলা আক্তার বৃষ্টি: শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# আমার স্বপ্নে অ-দেখা সেই তুমি

নাফিয়া ইসলাম

শরতের ওই কাশফুল
আর হেমন্তের হলুদ পুষ্প মঞ্জুরির মতো
যখন তোমার দিকে চেয়ে রই
কী অপর্ব! কাজলমাখা আঁখি।
যেন যমুনার মতো বয়েই চলেছে
চাইলেও চোখ ফেরাতে পারি না।
মনে হয়, অপলক ওই চোখের চাহনি
আমার হৃদয়ে বিদ্যুতের মতো কম্পন সৃষ্টি করে
মেঘের মতন বর্ষণ ঝরিয়ে দেয়।
এই বুঝি ভালোলাগা, স্তব্ধ রাতের স্বচ্ছ ওই জ্যোৎস্নায়
যখন চাঁদ মুখটা দিঘির জলে প্রতিচ্ছবি ওঠে
আশ্চর্য হয়ে দেখি,
কী অসহ্য অপরূপ ওই মুখখানা
চোখ ফেরানো যায় না,
ঠোঁটে বাঁকা চাঁদের হাসি
আমি যেখানেই যায় মনে হয়,
এক ফালি চাঁদ আমার পিছু নেয়,
আমায় ফিসফিসিয়ে কী যেন বলে ,
ওর ভাষা আমি বুঝি না।
আমার ছোট কুঁড়েঘর জোনাকিতে ভরে যায়,
কামিনী আর হাসনাহেনা ফুলের মিষ্টি গন্ধে
চারদিকের প্রকৃতি মৌ মৌ করে ওঠে।

নাফিয়া ইসলাম: শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# যখন আমি থাকবো না

তামিমা বিশ্বাস রিয়া

হয়তো একদিন আসবে যেদিন,
আমায় সবাই খুঁজবে।
আমার কথা মনে করে,
চক্ষু দুটি বুঁজবে।
দুচোখ দিয়ে ঝরবে ধারা,
যেমন নদীর খরধারা,
হবে সেদিন বাঁধন ছাড়া,
সকল বাধন ছুটবে।
হয়তো একদিন আসবে যেদিন,
আমায় সবাই খুঁজবে।
হয়তো সেদিন সকাল সাঁঝে,
ছোট বড় কাজের মাঝে,
মুখটি আমার পড়বে মনে।
আমার কথা বাজবে কানে,
তুমি পেছন দিকে ফিরবে,
দুটি আখি বুঁজবে,
হয়তো সেদিন তোমরা সবাই,
আবার আমায় খুঁজবে,
যখন তোমাদের ছিলাম কাছে,
ভুল বুঝতে সকাল সাঁঝে,
আজ যখন গেছি দূরে সরে,
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে,
আজকে ভুল বুঝতে পেরে,
করছো আফসোস তুমি?
এই আফসোসটা দেখার জন্য,
নাইবা রইলাম আমি।

যখন আমি থাকবো না,
তোমাদের আর ডাকবো না,
তখন তোমরা থেকো সুখে,
আমার কথা দূরে রেখে,
নাই-বা দিলাম আমার ছোয়া,
দূর থেকে করবো দোয়া।
খুশি থেকো, ভালো থেকো,
থেকো তোমরা সুখে,
সকল কান্না ভাসিয়ে দিয়ে,
মুচকি হেস মুখে।
জানি আমি ভাবছি যেটা,
কিছুই হবে না
আমি হারিয়ে গেলে তোমরা আমায়
মনেও রাখবে না।
না-হারিয়েও, অনেক দূরে হারিয়ে গেছি আজ
চাইলেই পারবোনা হয়তো হতে
তোমাদের সকাল-সাঁঝ।

তামিমা বিশ্বাস রিয়া: ছাত্রী, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

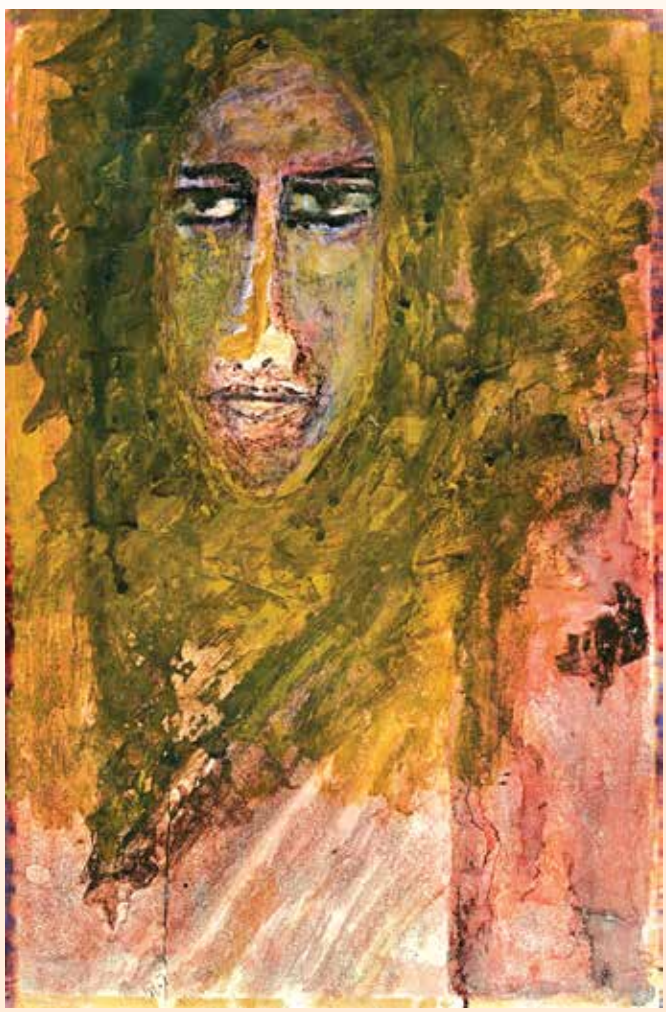

# যে রাত্রী হয়না ভোর

মোহাঃ খসরু ইসলাম

একটি নতুন দিনের প্রত্যাশায়
সোনালী সূর্যটা যখন নিজেকে গুটিয়ে নিল
লাল রঙে রাঙা হল পৃথিবী
পাখিরা গেয়ে উঠলো বেলা শেষের গান
শুরু হল নীড়ে ফেরার পালা
যেখানে রয়েছে খোলা
কল্পনার সব পাতাগুলো
আগামী দিনের স্বপ্ন রচিবার।
"আগামী ভোরের প্রথম যে আলোটুকু দৃষ্টি ছুঁয়ে যাবে
নিশ্চয় তা নতুন দিনের নতুন সূর্যের আলো হবে।"

আঁধারের বুক চিরে আকাশের কোলে
হেসে উঠলো পূর্ণিমার চাঁদ।
পুলকিত এক প্রত্যাশায় নিজেকে তুলে দিলাম নিদ্রাদেবীর হাতে।
নিদ্রাদেবী তার দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রেখে
আমাকে বড় একাকিত্বের ফাঁদে আটকিয়ে
যখন পালিয়ে গেল,
তখন মধ্য গগণে চাঁদ রাহুর কবলে।
পৃথিবীর সব রঙ আশ্রয় খুঁজে নিল আঁধারের মাঝে।
ভয়ংকর নীরবতা একটানা শাসন করে চললো পৃথিবীকে,
আশা আর আশংঙ্কার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম ভীরু পায়ে,
যতদূর চোখ মেলে চায়
শুধু দেখা যায়
উল্কার মত আশাগুলো
কেবল জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

দূর থেকে ভেসে আসা এক উন্মাদ শকুনের ডাকে
দু টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল নিসুতি রাতের নীরবতা।
রাহুর প্রতিপক্ষ হয়ে আকাশে নৃত্য করে কালো মেঘেরা
আজ চাঁদ তাদের চাই-ই।
অলস সময়গুলো লুকোচুরি খেলে রাতের আঁধারে

কাটেনা রাত বেড়ে যায় তা দ্বিগুণ হারে।
কোনোক্ষণে হয়তো সময় জেগে উঠবে
মিলিয়ে যাবে রাতের আঁধার।
তবু আশংঙ্কা
কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের সিক্ততায় জমে যাবে এ আঁখিপাত
মিলিয়ে যাবে সবটুকু আশা, স্বপ্ন দেখার সাধ।
নতুন সূর্যের আলোটুকু যখন পড়বে গায়ে এসে
তখন সে উঁকি দেবে হয়তো মধ্য গগণে বসে।

সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান (অবঃ)
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

# বিদায়

মো. হাবিবর রহমান

হাবিবের মনটা আজ ভাল নেই। এক অজানা আশঙ্কা তাকে তাড়া করে চলেছে। সবকিছু বিবর্ণ লাগছে। চারদিকটা কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে লাগছে, পরানের গহন থেকে জেগে উঠছে এক আকাশ হতাশা। একবার বিছানায় গড়াগড়ি দেয়, আবার উঠে গিয়ে টেবিলে বই নিয়ে বসে। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকে। তারপর উঠে গিয়ে অ্যালবামটা বের করে একের পর এক ছবি দেখতে থাকে। কলেজ পিকনিকের ছবিগুলোর মধ্যে একটি ছবির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। এক সঙ্গে লেখাপড়া করেছে দু'টি বছর। কখনও ভুলেও মনে আসেনি হঠাৎ করে বিদায় নিতে হবে। দ্বিতীয় বর্ষে পা রেখে বেশ কয়েকবার বলতে চেয়েও বলতে পারেনি- এক অজানা সংকোচ বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনের জোর হাবিবের কোন দিনই ছিল না। কথায় বলে অবোলার মুখই সব। হাবিবেরও ঠিক তেমনই অবস্থা। প্রকাশ করতে না পারলেও মিতাকে সে মনের কল্পনার সাথি করে রেখেছে। ছাত্র হিসেবে হাবিব যা-ই হোক চেহারা তেমন দর্শনধারী ছিল না। গুরুজনের মুখে শোনা যায়, আগে দর্শনধারী তারপর গুণবিচারি। মেয়েরা হয়তো পাত্র পছন্দের ব্যাপারে এই আদর্শে বিশ্বাস করে। তবে হাবিবের আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়নি এমন ছেলেমেয়ে ক্লাসে খুব কমই ছিল। মিতাকে সে বেশ কয়েকবার তার মনের কথা বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। কারণ মিতার মারমুখী কথার কাছে হাবিবের কোন কথা পাত্তা পাইনি। লজ্জায় অন্যদেরও সে কথা বলতে পারেনি। শুনেছি প্রেমের ক্ষেত্রে সাহসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই সাহস হাবিবের কোন দিনই ছিল না। স্কুল জীবনে তার বন্ধু হান্নান বলেছিল, তোর জীবনে কোন দিনও প্রেমিকা জুটবেনা। সে ওই কথার কোন মূল্যই দেয়নি বরং চ্যালেঞ্জ করে বলেছে, দেখে নিস একদিন আমিও প্রেম করে দেখিয়ে দিব, প্রেম কাকে বলে! অনেকে আবার ঠাট্টা করে বলেছে, দেখিস যেন লাইলি মজনু না হয়ে যাস। দরকার হলে তাও হব তবু প্রেম করেই বিয়ে করব। কখনও কখনও বন্ধুদের হাত দেখিয়ে বলেছে, এই দেখ আমার হাতে প্রেমের রেখা আছে। হস্তরেখায় বিশ্বাস না করলেও একেবারে অবহেলা করেনি। কলেজে কারণে অকারণে অনেক টাকা খরচ করেছে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। অনেক দিন অনেক পরিকল্পনা করেছে, আজ মিতাকে এই বলবে, উত্তরে সে যা উত্তর দিবে তার উত্তরে সে এই কথা বলবে ইত্যাদি ইত্যাদি ... কথা সাজিয়ে নিয়েছে। কিন্তু যখন মিতার দর্শন পেয়েছে, তখন সব পরিকল্পনা কোথায় হারিয়ে গেছে। বহু চেষ্টা করেও একটি শব্দও সে বলতে পারেনি। মনে হয় পেটে বোমা মারলেও আর একটি শব্দও বের হবে না। চোখের দিকে

চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। কথায় বলে লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু সেটা যে পুরুষেরও হতে পারে হাবিবকে না দেখলে বোঝা যায় না। হৃদয়ের কত না-বলা কথা মিতাকে সে বলতে চেয়েছে কিন্তু বলতে পারেনি শুধু লজ্জার কারণে। তবুও হাল ছাড়েনি, মনের দর্পনে মিতার ছবি অঙ্কন করে রেখেছে। কারণে অকারণে তাকে মনে করেছে। দেখা হলে শুধু পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, চল কেন্টিনে যায় নেহায়েত যেগুলো না বললেই নয়। কোনো দিন মিতার সঙ্গে দেখা হলে কাজের অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছে।

মিতার হাসি, হরিণীর মত চাহনি, লম্বা কেশ, বিশেষ ভঙ্গিতে বলা, হাঁটা সবই যেন হাবিবকে আকর্ষণ করেছে। চুপি চুপি কতদিন মিতাকে পর্যবেক্ষণ করেছে তার হিসেব নেই। যখনই মিতার সামনাসামনি হয়েছে তখনই তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বন্ধুদের চোখেও বিষয়টি অনেকবার ধরা পড়েছে, কিন্তু স্বীকার করতে চাইনি বরং বলেছে 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ'। তারপর তারা আর কথা বাড়ায়নি। অনেক দিন ভেবেছে মুখে তো অনেক কথা বলা যায় না। তাছাড়া বলার সময় তেমন সুন্দর সুন্দর কথাও পাওয়া যায় না বরং একটা চিঠি লিখে মনের কথা তাকে জানাতে চায়। কতদিন লিখে আবার ছিঁড়ে ফেলেছে এই ভেবে যে যদি সে প্রত্যাখ্যান করে, ওই চিঠি অন্যদের দেখায় তাহলে আর এই কলেজে পড়া হবে না। তার চেয়ে মুখে বলায় ভাল-কোন তো প্রমাণ থাকবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সরাসরি না বলে দিবে।

হাবিবের সারারাত ঘুম আসে না, এক অজানা উত্তেজনা আর উদ্বেগে ঘুম আসে না। এভাবে আর নয়, মিতাকে তার ভালোবাসার কথা বলতেই হবে। মনে বেশ জোর খুঁজে পায় সে। নিজের মনের কথা যদি তাকে নাই বলতে পারলাম তবে কিসের ভালবাসা! হ্যাঁ-না উত্তর তাকে পেতেই হবে- এভাবে আর নয়। মিতার জন্য তিলে তিলে মনের জ্বালা আর বাড়াবে না, যা হয় একটা করতেই হবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে হাবিব, মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি ট্রেন ছাড়তে। সে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পৌঁছে যায় হাবিব। একে একে খোঁজ করতে থাকে ট্রেনের কামরাগুলো, কোথায় উঠেছে মিতা। বন্ধুদের অনেককেই খুঁজে পায়, কিন্তু মিতাকে খুঁজে পায় না সে। হান্নানকে মিতার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব আসে না সূচক। হঠাৎ মিতার ডাকে হাবিব পিছন ফিরে তাকায়। মিতা জিজ্ঞাসা করে, কখন এসেছো?

হাবিব উত্তর দেয়, এইতো কিছুক্ষণ আগে।

মিতা বলে, তোমাকে গতকাল কলেজে খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পায়নি- কোথায় গিয়েছিলে?

হাবিব উত্তর দেয়, মনটা ভাল ছিল না, তাই রুমেই ছিলাম।

মিতা বলে, না-থাকারই কথা। তোমার মনের কষ্টটা আমি বুঝি।

হাবিব বলে উঠে, সত্যিই বোঝ?

মিতা বলে, বুঝবো না কেন, এত বড় হয়েছি কে-কি চায় কিছুটা হলেও বুঝতে পারি। তুমি যে আসবে সেটা আমি জানতাম।

হাবিব বলে, তুমি চলে যাচ্ছো আর আমি আসবো না! তুমি তোমার মনের কথাটা আমায় বলে যাবে না?

মিতা বলে, তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। গার্ড সাহেব বাঁশী দিয়েছে। গাড়ি এখনই ছেড়ে যাবে।

গতকাল তোমার জন্য একটি বই কিনেছি। বইটি ব্যাগ থেকে বের করে হাবিবেব হাতে দিয়ে মিতা আরো বলে, বইটিতে একটি কথা লেখা আছে 'ফুল যতক্ষণ পুরো না-ফোটে ততক্ষণ ছুঁতে নাই, ছুঁলে না-দেবে গন্ধ, না-দেবে ফল' কথাটায় আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, তুমিও এ কথায় একমত হবে।

হাবিব কোন কথা বলে না। ট্রেন চলতে শুরু করে। মিতা গাড়িতে উঠে হাত নাড়ায়। হাবিবও তাতে সাড়া দেয়। গাড়ি ক্রমেই চোখের আড়ালে চলে যায়। কখন যে তার দুগণ্ড বেয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে সে বুঝতেই পারে না।

**মো. হাবিবুর রহমান:** সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# সুন্দরবন এক্সপ্রেস

মোহা. খসরু ইসলাম

জানালার পাশে সিটে বসে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের যাত্রী শিমুল যাচ্ছেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। উঠেছেন নওয়াপাড়া স্টেশন থেকে। সুদর্শন শিমুল ধনী বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান। লেখাপড়া করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ম্যানেজমেন্ট থার্ড ইয়ার। বাবা একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ব্যবসাসূত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ঢাকার ধানমন্ডিতে নিজস্ব বাসায়। শিমুল গ্রামের বাড়ি নওয়াপাড়াতে ছুটি কাটিয়ে ফিরছেন ঢাকায়।

সুন্দরবন এক্সপ্রেস রাত ১১.৩০ মিনিটে বাজার সাথে সাথে যশোর জংশনে এসে থামলো। যাত্রীদের ট্রেনে উঠা-নামার প্রতিযোগিতা অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠলো। ট্রেন আস্তে আস্তে চলা শুরু করেছে, এমন সময় একজন মধ্যবয়সী যাত্রী একটি মাঝারি আকারের ব্যাগ নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল এবং শিমুলকে অনুরোধ করলো ব্যাগটা যেন তার হেফাজতে রাখে। ভিড় কমলেই সে নিয়ে যাবে। ট্রেনের গেটে ভিড় ঠেলে ব্যাগসহ উঠা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না হয়তো। শিমুল ব্যাগটি তার হেফাজতে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ট্রেন ছুটে চলছে। শিমুল তার গন্তব্যের দিকে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে যখন ইশ্বরদী পৌঁছালো তখন তার তন্দ্রা কেটে গেল। খেয়াল করে দেখলো তার কাছে সেই লোকের আমানত সেভাবেই আছে। ব্যাগের মালিকের কোনো খবর নেই। সে সিট থেকে উঠে গিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো। ব্যাগের মালিককে সে একনজর দেখেছিল। যতটুকু মনে পড়ে সে স্মৃতিটুকু নিয়েই অনুসন্ধান করতে লাগলো ঈশ্বরদী জংশনে। যাত্রা বিরতির পর ট্রেন আবার চলা শুরু করলো। শিমুল আশা ছাড়লো না। নিশ্চয় ব্যাগের মালিক আসবে সে প্রতিক্ষায় থাকলো। এভাবেই একসময় সুন্দরবন এক্সপ্রেস ঢাকা পৌঁছে গেলো। কিন্তু ব্যাগের মালিক আর আসলো না।

দু'হাতে দু'টি ব্যাগ নিয়ে অগত্যা ট্রেন থেকে নেমে পড়লো শিমুল এবং প্লাটফরম বেয়ে যখন গেটে এসে পৌঁছালো তখন দেখলো গেটে পুলিশ চেকিং হচ্ছে। ব্যাগে কি আছে পুলিশ জানতে চাইলে সে তার নিজের ব্যাগে বই এবং কাপড়-চোপড় আছে জানালো। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাগটির ক্ষেত্রে সে বললো, "আমি জানি না। আমার কাছে একজন আমানত রেখে চলে গেছেন আর খবর নেন নাই।" তার কথা শুনে পুলিশের কৌতূহল বেড়ে গেলো। ব্যাগের চেইনে ছোট একটা তালা ছিল। তালাসহ চেইন ছিড়তে পুলিশের বেশি সময় লাগলো না। কিন্তু একি! এ যে পলিথিনে মোড়ানো মানুষের মাথা! তখনও যেন ফোঁটা ফোঁটা রক্তের প্রবাহ থামে নাই। পুলিশের চেয়ে দ্বিগুণ অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছে শিমুল। মুখে কোনো ভাষা নেই। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তার কোনো সদুত্তর নাই। সব প্রশ্নের একটাই যেন জবাব– আমি জানি না। পুলিশের আইনে শিমুল এখন আসামি। স্বয়ং পুলিশ তাকে ধরেছে বোমালসহ। যথারীতি তাকে থানায় যেতে হলো এবং সেখান থেকে জেল-হাজতে।

মামলা চলাকালিন কোনোভাবেই প্রমাণ করা গেল না যে, ব্যাগটি অন্য লোকের ছিল বা সে লোকটির পরিচয় কি ছিল? শেষ পর্যন্ত মামলার রায়ে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় তার ফাঁসির রায় হলো। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলা হলো। পরবর্তী রায়ের অপেক্ষায় জেলখানায় কাটতে লাগলো তার দিনগুলো। শিমুলের মা একমাত্র পুত্র সন্তানের এহেন অবস্থার জন্য তার কষ্টের সীমা রইলো না। তিনি বিনিদ্র রজনী কাটাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে মায়ের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উঁকি দিতে থাকে। তিনি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, তাঁর ছেলে এ অপরাধ করতে পারে। তাহলে কেন এ বিচার? হাজারো প্রশ্ন মা'র মনে কিন্তু কোনো সমাধান নেই। অস্থিরতাই এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী।

একদিন মা আসলেন জেলখানায় শিমুলকে দেখতে। মা জেলখানার ইস্পাতের গ্রিলের এ পাশ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "বাবা, আমার মন বলে তুমি এ অপরাধ করনি,

তারপরেও কেন এ বিচার? শেষ বিচারের দিনে মহাবিচারকের সামনে কে জবাবদিহি করবে? তুমি না তোমার বিচারক? মা'র এ আকুলতা দেখে শিমুল নিস্তব্ধ হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শিমুল মা'র উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, "হ্যাঁ, মা আমিই দোষী। আমার বিচার হওয়া উচিত।" এই বলে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লো। মা শিমুলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শিমুলের মুখে ঘটনা শোনার জন্য মা অপলক নেত্রে চেয়ে রইলো। শিমুল নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। তারপর মাকে যা বললো তা আর এক গল্প।

শিমুলের ঢাকার বাড়িতে বিভিন্ন প্রকার দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করার জন্য দু'জন কাজের লোক ছিল। রাজু (২২) নামে যে লোকটি ছিল তার বাড়ি শিমুলের গ্রামে। শিমুলের বাবা তাকে ছোটকালে গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন। দিনে দিনে ছোট্ট রাজু শিমুলের সংসারে অপরিহার্য সদস্য হয়ে উঠে। অত্যন্ত কর্মঠ ও সৎ হিসেবে রাজুর সুনাম ছিল আকাশছোঁয়া। রাজু তার বাবা-মা'র ইচ্ছায় গ্রাম থেকে বিয়ে করে আনলো তারই খালাতো বোনকে। বাসার নিচতলার গ্যারেজের এক কোণে দু'টি রুম নিয়ে রাজুর সংসার। গৃহকর্তা এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রাজু ওই ফ্যামিলির বাইরের কাজ সামলায় আর তার স্ত্রী সামলায় ঘরের কাজ। রাজুর স্ত্রী বিউটি গ্রামের স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। দেখতে তার নামের মতই সুন্দর। একে তো বিউটির বাবা খুবই দরিদ্র তারপর গ্রামের বখাটেদের উৎপাত।

এজন্য খালাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে বিউটির বাবা হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন। বিউটি ঢাকায় এসে নতুন পরিবেশে সুন্দর থেকে আরো সুন্দর হতে লাগলো। যেন ফুটন্ত গোলাপ তার এক এক করে তার সকল পাঁপড়ি মেলে ধরেছে। এমতাবস্থায় বিউটির উপর চোখ পড়লো শিমুলের। বিউটির নিখুত সৌন্দর্য শিমুলের চোখ এড়ায় না। তারই চোখের সামনে ছবির মতো ঘুরে বেড়ায় বিউটি। শিমুল বিউটিকে অনেক টাকা-পয়সা, সোনার গহনাসহ কুপ্রস্তাব দিয়ে বসলো। কিন্তু শিমুলের প্রস্তাবে সে ইস্পাত কঠিন শক্ত থেকে ফিরিয়ে দিল। প্রায় ছয়মাস ধরে শিমুলের নানান প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। শিমুলের অবুঝ মন পিছনে ফিরতে চায় না। সামনে যেতেও বড় বাঁধা। একদিন সন্ধ্যায় শিমুল রাজুকে তার গাড়িতে নিয়ে নিজে ড্রাইভ করে চলছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি ভাইয়া? জিজ্ঞাসা করলো রাজু। শিমুল বললো, "চল তো, কাজ আছে।" পথের মাঝে শিমুল আরো দু'জন বন্ধুকে গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। ঢাকার শহরের অদূরে একটু নির্জন প্রান্তে এসে গাড়িটা থামার সাথে সাথে শিমুলের বন্ধুরা রাজুর কণ্ঠ চেপে ধরলো। রাজু কোনো কথা বলতে পারছিল না। তার শ্বাসরোধ করলেও প্রাণবায়ুকে রোধ করা গেল না। রাজুর দেহটা নিস্তেজ হয়ে গেল। শিমুল ভেবেছিল রাজুকে বিদায় করে দিতে পারলে বিউটি অসহায় হয়ে যাবে। তখন তাকে বশে আনা সহজ হবে। বাসায় এসে বলা হলো রাজু গাড়ির মধ্যে স্ট্রোক করেছে। সবাই বিশ্বাস করলেও বিউটি বিশ্বাস করেনি। তার কিছু করারও ছিল না। রাজুর মৃত্যুকে হজম করতে ধনীর দুলাল শিমুলের বেশি সময় লাগলো না। তড়িঘড়ি করে লাশ পাঠিয়ে দেওয়া হলো গ্রামের বাড়িতে। বিউটি শুধু বিধাতার কাছে এর বিচার চেয়ে ঢাকা ছেড়ে শূন্য হাতে আবার নওয়াপাড়ার গ্রামে ফিরে আসলো।

**মোহা. খসরু ইসলাম:** সহকারী অধ্যাপক (অব.), পদার্থবিজ্ঞান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# ফোন বন্ধের বার্তা

মো. মিলন হোসেন

আমার আর্মিতে জয়েনের দিনই আমাকে কিছু কড়া ইন্সট্রাকশন দেয়া হয়। কটু কথাও শুনতে হয় আমার ফিটনেস নিয়ে। লম্বার দিক দিয়ে খারাপ না-থাকলেও, আমার স্বাস্থ্য আর্মিসুলভ ছিল না। এমনিতেও বাড়িতে খাওয়া দাওয়াতে প্রচুর অনিয়ম করেছি। সেই অনিয়মের জন্য কোনও কথা শুনতে হয়নি। আজ শুনতে হচ্ছে। নিজের মোবাইল ফোন অফিসে জমা রাখতে হবে। ন' মাসের ট্রেনিংয়ে একবারও মোবাইল চাওয়া যাবে না। অফিসারের প্রত্যেকটা কথা শুনতে হবে। অফিসার যদি বলে আজকে সারাদিন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে, রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রশ্ন করা যাবে না। বাড়িতে ফোন করার জন্য বারবার রিকুয়েস্ট করা যাবে না, খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে আসা ফোন আমায় দেওয়া হবে না ট্রেনিং সেশনের সময়। এ জন্য কোনও কমপ্লেইন করা যাবে না। অসুস্থ হওয়া যাবে না। অসুস্থ হলেও ট্রেনিং বন্ধ থাকবে না। অজুহাত নামের হাত কেটে ফেলে দিতে হবে। আমার জন্য অন্যরকম একটা ইন্সট্রাকশন দেয়া হলো। সারাদিনে ২০০টা পুশ আপ দিয়ে অফিসারকে রিপোর্ট করতে হবে। এই দু'শো পুশ আপের জন্য আমাকে এক ঘন্টা সময় দেয়া হবে। এই ২০০ পুশ আপ আমার অতিরিক্ত ওজনের জন্য দিতেই হবে। আমার বাকি রিক্রুট বন্ধুরা যখন ১ ঘন্টার জন্য আনন্দ বা বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজ করে তখন আমাকে ২০০ পুশ আপ শেষ করতে হবে। অনেক কথা বলা হলো, অথচ আমার পরিচয় দেয়া হয় নি। আমার নাম মিলন, থাকি মেহেরপুর। দুই ভাইয়ের মধ্যে আমি ছোট। বড় ভাই পড়াশোনা শেষ করে দেশের বাইরে গেছে। আমি আর্মিতে কিভাবে আসলাম, সেই বিষয়ে কথা আর নাই বা বললাম। তবে এইখানে পাঠানোর জন্য অনুভার আলাদা একটা তাগিদ ছিলো। অনুভা কে সেইটা নিয়েও পরে কথা বলি। কাজের কথাই ফেরত আসি। প্রথমদিনেই আমি কুপোকাত। ৪০টা পুশ আপ দিয়ে আমি আর নড়তে পারছিলাম না। নির্দেশ ছিল ২০০ পুশ আপ শেষ করলেই দুপুরে খেতে পারবো। সেইদিন দুপুরে না খেয়ে ছিলাম। রাতে অবশ্য খাবার পাই। দিনে আবার সেই একই কাজ। পুশ আপ, ২০০টা। এবার ২০টা পুশ আপ দিতে গিয়ে মনে হলো হাত ভেঙে যাবে। আজ ইন্সট্রাকশন ছিল এক ঘন্টার মধ্যে ২০০ পুশ আপ না দিতে পারলে পানিশমেন্ট আছে। পানিশমেন্টের জন্য রাজি হয়ে গেলাম। তবুও অন্তত দুপুরের খাবার দিক! পানিশমেন্ট ছিল এক পায়ে দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া। অনেক কষ্টের কথা বললাম, তাই না? আসেন আসল কষ্টের গল্প করি। অনুভাকে আমি চিনি তিন বছর ধরেই। ও থাকে ধানমন্ডি। ভার্সিটিতে থাকাকালীন ওর সাথে রিলেশন।

প্রচণ্ড পছন্দ করতাম ওকে, ভালোবাসতাম। তখন আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে প্রেম থেকে বিয়ে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তখন অনুভা বললো, তার বাবা-মা আর্মি ছেলে পছন্দ করে। আর আমারও ছোট থেকে স্বপ্ন আমি দেশের জন্য কিছু করবো। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গর্বিত পোশাক পরবো। অনুভার মুখ থেকে কথাটা শুনার পর এই স্বপ্নটা আরো জোর দিয়ে পূরণ করার পথে নামি এবং আল্লাহ্ মনের আশা পূরণ করেন। চাকরি পাওয়ার পর আমাদের প্রেম ভালোবাসা আর লুকানো ছিল না। আমার আব্বা আম্মা জানতো। ওর বাবা মায়ের সাথে আমাকে ও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। বাবা রিটায়ার্ড সরকারি কর্মকর্তা, বড় ছেলে দেশের বাহিরে, ছোট ছেলে আর্মিতে যাবে, এগুলো শোনার পর অনুভার বাবা-মা আমাকে তাদের ছেলের আসনে বসিয়ে দিলো। এগুলো কিভাবে কষ্টের গল্প হয়? জানেন প্রচণ্ড ঝালের আগে মুখে এক মুহূর্তের জন্য মিষ্টি মিষ্টি লাগে? এইগুলো সেই এক মুহূর্তের মিষ্টি। অনুভার বাসায় আব্বা-আম্মা দু'জনই যায়। আমাদের ব্যাপারে কথা হয়। সিদ্ধান্ত হয় আমি আর্মিতে জয়েন করবো, ও তার এক বছর পর আমাদের বিয়ে হবে। আংটি বদল হয়ে গেলো ওইদিনই। এক সপ্তাহ পর আমি এখানে, ২০০টা করে পুশ আপ দিচ্ছি আর মরে যাচ্ছি। এখানে আসার আগে আমাকে অনুভা বলেছিলো, ওখানে পৌঁছেই একটা ফোন করে ওকে যেন জানাই। ওকে ফোন তো দূরের কথা ওর ছবিটাও ভালো করে দেখতে পারিনি। বাসায় জাস্ট জানানো হয়েছে যে আমি এখানে পৌঁছেছি, ব্যস। দেখতে দেখতে এক দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। কোনও পানিশমেন্টেই আমার ডেভেলপ করানো সম্ভব হচ্ছিলো না। আমাকে অফিসার হুট করে একদিন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। প্রেমটেম করো নাকি? না, স্যার। মিথ্যা বললে ১০০ পুশ আপ আরও করাবো। আবার বলছি, প্রেম টেম করো? না স্যার। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ওর নাম কি অনুভা? আমি পুশ আপ বন্ধ করে অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর আমাকে ইন্সট্রাকশন দিলেন। প্রতিদিন ২০০ পুশ আপ দিলে ২০০ সেকেন্ড করে অনুভার সাথে কথা বলতে পারবো। ৩ মিনিট ২০ সেকেন্ড। দু'দিন পর কথা বললে ৬ মিনিট ৪০ সেকেন্ড। ২০০ পুশ আপ এর কম পুশ আপ দিলে এক সেকেন্ডও কাউন্ট হবে না। ২০০ পুশ আপ এর বেশি পুশ আপ দিলে সেটা কাউন্ট হবে। ওকে স্যার, বলে আমি একটা চিৎকার দিলাম ও পুশ আপ দিতে শুরু করলাম। সেদিন অনেক কষ্টে ৯০ টা পুশ আপ দেই আমি। আমার সর্বকালের রেকর্ড। এক মাস ধরে আমি এই সেশনে আছি। অন্যান্য ট্রেনিংগুলোও করছি। তবে আগের চেয়ে পুশ আপ একটু সহজ হয়ে গেছে। প্রতিদিন অবশ্য ২০০ পুশ আপ দেয়ার আগেই আমার স্ট্যামিনা একদম শেষ হয়ে যায়। অফিসারের ঘড়িতে এখনও এক মিনিট যোগ হয়নি। দুই মাস পর সেই শুভক্ষণ আসলো। জীবনে প্রথমবার ২০০ টা পুশ আপ দিলাম। প্রচণ্ড খুশিতে অফিসারকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার ৩ মিনিট ২০ সেকেন্ড অফিসারের ঘড়িতে এড হয়ে গেলো। সেইদিন রাতে অফিসার আমার সামনে দাঁড়িয়ে স্টপওয়াচে সময় দেখছে আর আমি অনুভার সাথে কথা বলছি দূরে দাঁড়িয়ে। ওকে বললাম, অল্প সময়ে কথা শেষ করতে হবে। ও বললো, ঠিক আছে। অল্প অল্প করে কথা বলবো। আমরা এভাবে কথা বললাম, 'কেমন আছো?' 'ভালো। তুমি?' 'ভালো। সবাই ভালো আছে?' 'এখানে ওখানে সবাই ভালো আছে।' 'রাতে কি খেলে?' 'শুটকি আলু, ডাল, ভর্তা আর ভাত, তুমি?' 'রুটি, ডাল, লাবড়া।' 'কবে আসবে?' 'জানিনা। গল্প শুনবে?' 'হু বলো।' 'এক ছিল রাজা আর এক ছিল রাণী। রানী খেতো শুটকি আর রাজা খেতো লাবড়া। একদিন রাণীর গলায় শুটকির দলা আটকে গেলো আর রাণীর কণ্ঠ হয়ে গেলো শুটকির মত শুকনো।'

তারপর?' 'রাজা ভাবলো, রাণীর মত অবস্থা তারও হওয়া উচিত। রাজা রাণীকে অনেক ভালোবাসতো।' 'মোটেই বাসতো না। রাজা ছিল কঞ্জুস। উচিত হইসে লাবড়া খাওয়ায় রাজা কে।' 'না না, রাজা রাণীকে অনেক ভালোবাসতো। তাই রাজা ভাবলো সেও রাণীর মত গলায় লাবড়ার দলা আটকে নিজের গলা লাবড়ার মত স্বাদহীন করে ফেলবে। কিন্তু লাবড়া এত পিছলা, যত বড় দলাই বানায় গলায় আটকায় না। পিছলে পেটে চলে যায়' 'কি বলছো তুমি এগুলো? অন্য কিছু বলো। উলটাপালটা গল্প বলে খালি।' 'কি বলবো বুঝতে পারছি না। মাথা কাজ করছে না।' 'কিছু বলতে হবে না। একবার আমি বলবো, ভালোবাসি, একবার তুমি বলবে, ভালোবাসি। পারবে না?' 'হু পারবো!' আমরা টানা ৩৮ সেকেন্ড একে অপরকে ভালোবাসি বলে গেলাম। তারপর ফোন রেখে দিলাম। আমার সময় শেষ। পরের দিন আবার ২০০ পুশ আপ কমপ্লিট। তার পরের দিন। তার পরের দিন। আমরা তিন মিনিট, চার মিনিট আর কয়েক সেকেন্ডের জন্য অপ্রয়োজনীয় কথা বলতাম। কয়েক সেকেন্ড একে অপরকে ভালোবাসি বলতাম। কিন্তু কয়েক মিনিট কথা বলে আমাদের পোষাতো না। আমি একটানা এক সপ্তাহ পুশ আপ দিলাম। অতিরিক্ত পুশ আপও দিতে থাকলাম। আমার ঘড়িতে জমলো ২৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। অনেক সময়। তারপরের দিন বাসা থেকে ফোন আসলো। ইন্সট্রাকশন বলে, প্রচণ্ড ইমার্জেন্সি না হলে বাড়ি থেকে ফোন আমি রিসিভ করতে পারবো না। কিন্তু আমাকে সেদিন বলা হলো, মিলন, ইটস এন ইমার্জেন্সি। আমার বুক ধুকপুক করতে লাগলো। আমার ভাই থাকে দেশের বাইরে সেখানে তার কোনো ক্ষতি হলো কি না। আমি ভাবলাম ভাইকে নিয়ে খুব খারাপ কিছু শুনতে যাচ্ছি। ফোন রিসিভ করে জানতে পারলাম, ভাই ভালো আছে। অনুভা একসিডেন্ট করেছে, অবস্থা খারাপ। ভাই আমার তিন দিনের ছুটির ব্যবস্থা করেছেন।

আমাকে আসতে হবে। হাসপাতালে যাওয়ার আগেই অনুভা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য মারা যায়। রেইপ এন্ড মার্ডার কেস। দিনে দুপুরে, তাও বাসের ভিতর। অনুভার কথামতে, সব যাত্রীকে যাত্রাবাড়ি নামিয়ে দেয়া হয়। ওকে বলা হয় শেষে নামতে, সবাই নামলে আরামে নামতে পারবে সে। সবাই নেমে যাওয়ার পরপরই বাস এক টানে জায়গা ত্যাগ করে। অনুভা বাস থেকে নামতে পারেনি। তিন দিনের ছুটি কাটাতে ইচ্ছে হলো না। দুই দিনের মাথায় ক্যাম্পে ফেরত আসলাম। অফিসার জানতে চাইলেন, কেমন আছে অনুভা। আমি কিছু বলতে পারলাম না। রাতে হুট করে অফিসারের তাবুতে গিয়ে বললাম, ঘড়িটা দিতে। আমার নামে ২৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড মজুদ আছে। অফিসার এই প্রথমবার আমার হাতে ঘড়িটা দিয়ে দিলেন, আমার সাথে আসলেন না। আমি নির্বিকার ভাবে বের হয়ে আসলাম। জায়গাটা খোলামেলা, উপত্যকার মত উঁচু নিচু। আমি ঘড়িটা চালু করি আর অনুভাকে ফোন দেই। ও পাশ থেকে জানায়, ফোন বন্ধ আছে। আমি ওই ফোন বন্ধের বার্তা শুনতে থাকি আর মূর্তির মত চোখ বড় বড় করে চোখের পানি ফেলি। আমার ২৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড যেন শেষ হওয়ার নয়।

মো. মিলন হোসেন: ছাত্র, একাদশ শ্রেণি

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

সাহিত্য একটা তীব্র নেশা, রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যাকে একবার এই নেশা ধরে, তার আর অন্য কোনো গতি থাকে না। আবার এ কথাও হয়তো ঠিক, অনেক লেখাই এক এক সময় এই নেশা থেকে মুক্তি পেতে চায়! সাহিত্য সৃষ্টিতে খ্যাতি-কীর্তি-অর্থের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তার জন্য লেখককে ভেতরে ভেতরে কত কষ্ট যে সহ্য করতে হয়! এক একসময় রক্ত ক্ষরণের মধ্যে মিশে যায় শব্দের বিষ, তা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

# নীরব শক্তি

তানজিফ রহমান অর্পণ

ঈমের ঘুম ভাঙল সকাল ১০ টায় কলিংবেলের আওয়াজে। দরজা খুলতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু আদিত্য। তার অবস্থা দেখেই নাঈম বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। আদিত্য বলতে শুরু করল, গতকাল রাতে তোর মামার লাশ পাওয়া গেছে টিএসসির মোড়ে। তোর বাবা আর চাচার লাশের মতো উনার গায়েও লেখা ছিল you cannot find me, yours dear 6578847375। নাঈম কিছুক্ষণ নীরব রইলো তারপর বলল আর যাই হোক এটা ওর ফোন নাম্বার না, খুনগুলো যে করছে তার সাথে নিশ্চয়ই আমার অথবা আমার পরিবারের কোন শত্রুতা রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে সে একজন সাইকো। তুই কি পুলিশকে খবর দিয়েছিস? আদিত্য বললো, হ্যাঁ আমি লাশ দেখামাত্রই তাদের খবর দিয়েছি। আর লাশের পাশে একটা চিরকুটে লেখা ছিল–

" যতই ভাবিবে তবুও ধরিতে পারিবে না মোরে

তোমারই কাছের মানুষ আমি একই চাকার ঘোরে"

নাঈম আদিত্যকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিজের রুমে এসে চোখ বন্ধ করে সব বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকল। এতগুলা সূত্রের মাঝে কোনো একটা যোগসূত্র কি দাঁড় করানো যায়? নাহ! সবই যেনো কেমন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। আরো ভালো করে ভাবতে হবে। নাঈম এবং আদিত্য বুয়েটের CSE বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। গত একমাসে যেনো নাইমের জীবন দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে, প্রথমে তার বাবা এরপর তার চাচা এবং সবশেষে আজকে তার মামা নিখোঁজ হওয়ার পর খুন হলেন। প্রত্যেকটা লাশের গায়েই চাকু দিয়ে খোদাই করে ওই নাম্বারটা লেখা ছিল। বাড়ির নম্বর, ফোন নম্বর, জন্ম সাল, গাড়ির নম্বর কোনোটাতেই তো এই নাম্বারটা খাপ খাচ্ছে না, তাহলে কিসের ক্লু হতে পারে এটা? এগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতেই প্রায় দুপুর হয়ে গেল। ইতোমধ্যেই তার ছাত্রছাত্রীরা পড়তে চলে এসেছে। নাঈম অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে হওয়ায় তাকে টিউশনি করেই নিজের খরচ চালাতে হয়। সে ইন্টারমিডিয়েটের আইসিটি সাবজেক্টটি পড়ায়। আজকে তার পড়াতে মন চাচ্ছিল না, কিন্তু সকলেরই সামনে পরীক্ষা থাকায় বাধ্য হয়েই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশের শেষ লেকচারটা দেওয়া শুরু করলো সে। আজকের লেকচার কম্পিউটার কোড সম্পর্কে। লেকচার শেষ করে সে সবাইকে জিজ্ঞাসা করল তারা বুঝতে পেরেছে কিনা। হঠাৎ জাবির বলে উঠলো, ভাইয়া এটা তো একটা মজার খেলা, আমি সংখ্যার মাধ্যমেও নিজের নামকে প্রকাশ করতে পারবো। নাঈম প্রথমে আনমনে হ্যাঁ বললেও কিছুক্ষণ পরেই বিষয়টি তার মাথায় পরিষ্কার হয়ে উঠল। সে দ্রুত তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ছুটি দিয়ে আদিত্যকে সাথে নিয়ে থানায় রওনা দিল। সে ইন্সপেক্টরকে বলল, স্যার, এই সকল খুন অন্তিক করেছে। ইন্সপেক্টর বলল, এতটা শিওর হয়ে তুমি কিভাবে বলতে পারছ, এর কারণ কি আর অন্তিক কে? নাইম তখন বলতে শুরু করলো, অন্তিক আসলে বুয়েটে আমার সাথে CSE-তেই পড়ত। বুয়েটের হলে আমরা একই রুমে থাকতাম, ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে ও গোপনে মাদক সেবন করত যেটা পরে আমি বুয়েট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম, ফলে ইউনিভার্সিটি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় আর ওর মা এই অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। আপনারা যে চিরকুট পেয়েছিলেন সেখানে লাস্টে লেখা ছিল "একই চাকার ঘোরে"। ঘোরে মানে ঘরে, আর চাকা অর্থাৎ ফ্যান, সুতরাং খুনি আমার রুমমেট। কিন্তু এর চেয়েও বেশি শিওর তখন হলাম যখন কম্পিউটারের আসকি কোডের সংখ্যার সাথে তার নামের ইংরেজি অক্ষরগুলো মিলে গেল। CSE Department এর ছাত্র হওয়ায় এই কোডটি তার নখদর্পণে ছিল। লাশের গায়ে যে সংখ্যাগুলো লিখা ছিল এগুলোকে আসকি কোডে রূপান্তরিত করলে ইংরেজি ANTIK নাম আসে। ৬৫ তে অ, ৭৮ এ ঘ, ৮৪ এ ঞ, ৭৩ তে ও, ৭৫ এ ক. আমার কারণে তাকে বহিষ্কার হতে হয়েছিল বলেই হয়তো সে আমার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছিল। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাকে ধরবার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং দুই দিনের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করে। তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার পর অন্তিক খুনের স্বীকারোক্তি মূলক জবান দেয় এবং আদালতে তার ফাঁসির রায় ঘোষণা হয়। বাড়ি যাওয়ার সময় নাঈম দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, "মানুষ প্রজাতিটি কতই না বিচিত্র!"

তানজিফ রহমান অর্পণ: শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

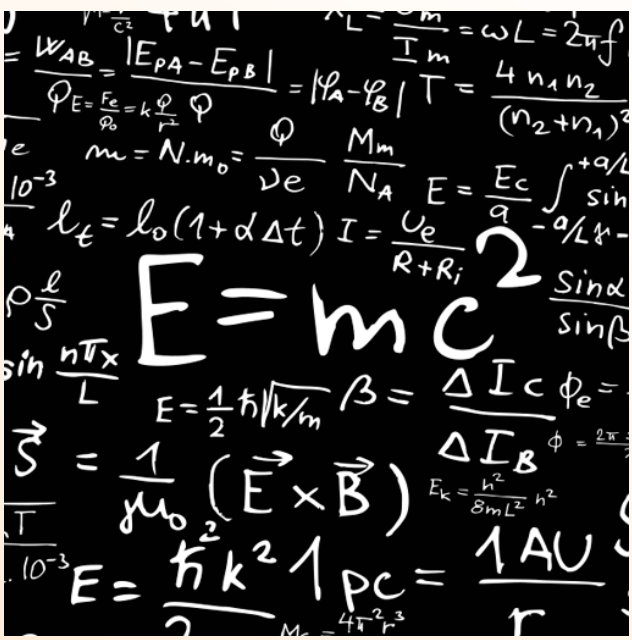

# দুরন্তপনা

## মুস্তাকিম আল সাবিক

বৃষ্টির পানিতে বিলের পানি যেন মনে উপচে পড়ছে। বিলের আশে পাশে কেউ নাই। মোমিন আর জিহাদ দুটি ডিঙি নৌকায় আটকিয়ে আছে মাঝখানে, হাতে দু'জনের দু'টো বাঁশ। ডিঙিতেও পানি ঢুকছে অল্প অল্প করে। ফেরত আসাও সম্ভব না। ফিরতে হলে অপর পাড়ে পৌঁছাতে হবে। সাঁতার না জানা দুই কিশোর ছেলের চোখে মৃত্যুর হাতছানি। তারা যে ভয় পাচ্ছে, মৃত্যু যে তাদের ডাকছে। তারা কী জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে? তাদের অপেক্ষায় থাকা মায়েদের কাছে? মোমিনের বয়স ১৫ বছর। চঞ্চলতা ও দুরন্তপনা দু'টি শব্দ যে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখা করা সময় সম্ভব, মায়ের হাতে মারও তো কম খায়নি। নজরদারিতে রাখতে হয় সব সময়। কিন্তু নানি বাসায় নানির হেফাজতে থাকলে যে মায়ের বেতের বাড়ি পিঠ পর্যন্ত পৌঁছায় না। সে নয়, তার মামাতো ভাই জিহাদও আছে তার সঙ্গি হিসেবে। বয়সে তারা একই বয়সের। চঞ্চলতায় তাদের রাকে দিলে জিহাদ যদিও মোমিনের নিচে থাকবে, কিন্তু নিঃসন্দেহে অন্য ছেলেদের উপরেই থাকবে। মোমিনের অনেক দিন পর আসা হলো গ্রামে। গ্রামের নাম দর্শনা। গ্রামকে সে অনেক মিস করেছে। গ্রামের মাঠ-ঘাট, পুকুর বিলে যে আনন্দ আছে তা কী আর শহরের কোলাহল, অট্টালিকা ও ব্যস্ততায় পাওয়া যায়! দর্শনাই পৌঁছেই তার যে জিহাদের সাথে দেখা করা প্রয়োজন, আগের বার লিটন ভাই এর সাথে ঘুরতে যাওয়ার সময় সে এক মোটর সাইকেলের সাথে অ্যাকসিডেন্ট করে, পায়ে ভালোই আঘাত পেয়েছিল। বাসায় এখনো কেউ যানে না, বলা হয়েছে খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলো।

মোমিন: জিহাদ, জিহাদ, আছিস নাকি?

জিহাদ: আরে মোমিন, কেমন আছিস ভাই তুই? অনেকদিন পর দেখা হলো।

মোমিন: আমিতো বেশ ভালোই আছি । তুই বল, তুই কেমন আছিস? পায়ের কী অবস্থা।

জিহাদ: ও ঘটনার তো অনেকদিন হয়ে গেলো। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

মোমিন: বাসার কেউ জানতে পেরেছে নাকি? কী হয়েছিল?

জিহাদ: না কেউই জানে না। লিটন ভাইও কাউকে কিছু বলে।

মোমিন: যাক ভালোই। না হলে অনেক বকতো। আচ্ছা শোন আমি কিছু দিন থাকছি এখন গ্রামে। অনেকদিন পর গ্রামে আসলাম তো। একটু ঘুরে দেখা দরকার। চ কাল বিলের ধার থেকে ঘুরে আসি।

জিহাদ: বিলে যাবি তো বেশ ভালোই কিন্তু সাঁতার শিখেছিস নাকি? আমি কিন্তু সাঁতার পারি না। দুই দিনের বৃষ্টিতে এখন বিলে কিন্তু অনেক পানি।

মোমিন: না, আমিও পারি না। আরে! তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? আমরা নামবো নাকি, ধার থেকে ঘুরে চলে আসবো।

মোমিনের নানি বাসার পাশেই একটা ছোট বিল। বিলটা অতোটা বড় না। পানিও সাধারণত কম থাকে। কিন্তু মুষল ধারে বৃষ্টিতে এখন বিলের দুই ধার ডুবে গেছে। মোমিন নানি বাসায় আসলেই জিহাদকে সঙ্গে নিয়ে বিলে পানিতে গোসল করতে একবার হলেও যায়। বিলের ধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঠান্ডা পানিতে গোসল করার যে এক আলাদা মজা আছে! পরদিন তারা গেল বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। চারিদিকে ফসলি জমির মাঝে বিলটাকে দেখতে এমনি অপরূপ লাগে, তার ওপর বৃষ্টির থৈ থৈ পানির উপর সূর্যের রশ্মির বিকিরণ যে বিলের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে তাদের বেশ ভালোই লাগছিলো, এমন সময় দেখতে পেলো বিলের ধারে দু'টি ডিঙি নৌকা বাঁধা। আশে পাশেও কেউ নাই। অনায়াসে ডিঙি দু'টি নিয়ে ওপার থেকে চলে আসা যায়। জিহাদ যেতে না চাইলে মোমিন এক রকম জোর করেই তাকে সঙ্গে নিলো। সাথে থাকলো বাঁশের দু'টি ভিত্তি, হাতে দুই জনের দুইটা বাশের বৈঠা। ভিঙি হলো এক প্রকার ছোট নৌকা যার একটিতে একজনই চড়া যায়। সামনে এগোনোর জন্য ব্যবহার করা হয় বড় বাঁশ যা পানির নিচের মাটিকে ঠেলে সামনে এগিয়ে যায়। সাধারণ নৌকার চেয়ে ভিঙি নৌকা নিয়ন্ত্রণ করা একটু বেশি কঠিন সামান্য ভুলের জন্যও ভিঙি উল্টিয়ে যেতে পারে। মোমিন, জিহাদ কিন্তু খুব ভালো করে জানতো ডিঙির বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে ভাবার মতো অবকাশ ছিলো না। দু'টি ভিঙি নিয়ে বিলের স্বচ্ছ পানির উপরে ভাসা যে রূপকথার গল্পের মতো। দেখতে দেখতে তারা পৌঁছে গেলো বিলের মাঝখানে।

মোমিন: জিহাদ, কেমন লাগছে?

জিহাদ: এতোখোন ভালোই লাগছিলো। এখন ভয় করছে। চল, ফেরত যাই।

ফিরে যাওয়ার জন্য পেছনে তাকিয়ে তারা অবাক হয়। পাড় থেকে কখন এতো দূরে চলে এসেছে তারা বুঝতেও পারেনি। এখন আর ভিঙি ঘোরানো সম্ভব না। বাড়ি ফিরে যাওয়ার একটাই উপায় বিলের অপাশে পৌঁছানো। কিন্তু কীভাবে তাঁদের বাঁশও যে আর পানির নিচের মাটির স্পর্শ পাচ্ছে না। কীভাবে সামনে আগাবে এর মধ্যে, কথায় আছে না যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। এর মধ্যে মোমিনের ডিঙিতে অল্প অল্প পানি ঢোকাও শুরু করেছে। মৃত্যু কী তাদের শেষ পরিণতি? জিহাদ কান্না জড়িত কণ্ঠে ভাই, আমার খুব ভয় করছে। আমরা মনে হয় আর বাঁচবো না। আমাদের আসাই ঠিক হয়নি। আশে পাশে আমাদের বাঁচানোর মতোও কেউ নাই। মোমিনের চোখে-মুখেও ভয় স্পষ্ট উৎকণ্ঠাই তার কণ্ঠও ভেঙে পড়ছে : ভাই, তুই ভয় পাস না। আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে নেবেন। তুই ভয় পাস না। সামনে এগানো আর দরকার নাই। বাঁশটা দিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখ। কোনোভাবেই যেন ডিঙি উল্টিয়ে না যায়। দু'জনই সামনে এগোনোর চেষ্টা ছেড়ে দিলো। বাঁশের মাধ্যমে নিজের নিয়ন্ত্রণ ঠিক রেখে বডিতে দাঁড়িয়ে থাকলো তাদের ভিত্তি এক জায়গায়। কিন্তু এভাবেও আর বেশিক্ষণ না। ডিঙিতে যে পানি ঢোকা শুরু করেছে। তারা কী বেঁচে বাড়ি ফিরতে পেরেছিলো? না কী সময়ের পরিক্রমায় অতল গর্ভে হারিয়ে যায় তাদের দেহ দু'টি। না, তারা সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে সক্ষম হয়। রাখে আল্লাহ মারে কে, বিলে মাছ ধরতে আসা এক মাঝি মাঝ বিলে আটকায় থাকা শিশু দু'টির চিৎকার শুনতে পায়। তিনি তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন এবং সুস্থভাবে তাদের বাসায় পৌঁছায় দেন। বাসার সবাইকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলেন, তারা দু'জন জীবন সম্পর্কে বড় একটা শিক্ষা পায়।

মুস্তাকিম আল সাবিক: ছাত্র, একাদশ শ্রেণি
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কর্মফল

মো. মিলন হোসেন

এক গ্রামে একজন কৃষক ছিলেন, কৃষকের নাম মিলন। মোহনলালের গ্রামের নাম অভয়নগর। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা স্রোতস্বিনী নদী। গ্রামের মাঠে ফসলের জমিগুলোতে মাঝে মাঝে হালকা বাতাসের তালে তালে ধান গাছগুলো যখন দোলা দিয়ে উঠে। তখন সৃষ্টি হয় এক অপরূপ দৃশ্যের। যেনো মনের আনন্দে নেচে নেচে খেলা করে ধান গাছগুলো। মোহনলাল এবং তার স্ত্রী গাভী পালন করে কোনোভাবে তাদের সঙসারে খরচ জোগাড় করেন। তারা দুধ থেকে দই এবং মাখন তৈরি করে বিক্রি করতেন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও মোহন লালের স্ত্রী মাখন তৈরি করে মোহনলালের হাতে তুলে দিলেন মাখনগুলো বিক্রি করতে। মাখন বিক্রি করার জন্য গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন মোহনলাল। মাখনগুলো গোল-গোল রোল আকৃতিতে রাখা ছিল। যার প্রত্যেকটির ওজন ছিল এক কেজি করে। শহরে পৌঁছে কৃষক প্রতিবারের ন্যায় পূর্ব নির্ধারিত দোকানে মাখনগুলো দিয়ে পরিবর্তে চা, চিনি, তেল ও তার সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আসতেন। আজ কৃষ চলে যাওয়ার পরে দোকানী মাখনের রোলগুলো একটা একটা করে ফ্রিজে রাখার সময় ভাবলেন মাখনের ওজন সঠিক আছে কি না মাখনের ওজর আসলে এক কেজি নয় বরং প্রতিটা মাখনের ওজন নয়শত গ্রাম করে। পরের সপ্তাহে আবার কৃষক উক্ত দোকানে মাখন বিক্রি করতে গেলেন। দোকানের সামনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দোকানী কৃষকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলিে লাগলেন, বেরিয়ে যাও আমার দোকান থেকে। এবার থেকে বরং কোনো বেঈমান চিটিংবাজের সাথে ব্যবসা করবো না। আমার দোকানে আর কোনোদিন পা রাখবে না। নয়শত গ্রাম মাখন এক কেজি বলে বিক্রি করো। তোমার মতো লোকের মুখ আমি দেখতে চাই না। কৃষক বিনম্রভাবে কম্পিত স্বরে দোকানদারকে বললেন, দাদা দয় করে রাগ করবেন না। আসলে আমি খুবই গরীব মানুষ দাঁড়িপাল্লার বাটখারা কেনার মতো পয়সা আমার নেই। তাই আপনার থেকে প্রতিবার যে এক কেজি করে চিটি নিয়ে যেতাম। সেটাই দাঁড়িপাল্লার একপাশে রেখে অন্য পাশে মাখনের রোল দিয়ে মেপে নিয়ে আসতাম। প্রিয় পাঠক এখানে শিক্ষণীয় বিষয় কী জানেন? আপনি অপরকে যেটা দেবেন, সেটাই পরে আবার আপনার কাছে ফিরে আসবে সেটা কোনো দ্রব্য সামগ্রী অথবা সম্মান বা ঘৃণা ইত্যাদি হতে পারে। কাউকে ঠকাতে চাইলে আপনিও অবশ্যই ঠকে যাবেন। এটাই বাস্তবতা বা আমাদের জীবনের কর্মফল।

মো. মিলন হোসেন: ছাত্র, একাদশ শ্রেণি
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সিংয়ের গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা

ড. সঞ্জয় বল

## ফ্রিল্যান্সিংয়ের পটভূমি

মানুষ স্বভাবতই মুক্তভাবে জীবনযাপন করতে বেশি পছন্দ করে। কারো অধীনস্ত হয়ে বা কারো নির্দেশমত কাজ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে না। এই মুক্তমনা পেশার ধারণা হলো ফ্রিল্যান্সিং। অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নির্দেশ অনুযায়ী কোনো কাজ না করা। মূলত যারা এ ধরনের কাজ করেন তাদের বলা হয় ফ্রিল্যান্সার। ফ্রিল্যান্সিং হলো একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থায়ী চুক্তি না করে একটি প্রকল্পের ভিত্তিতে কাজ করা। ফ্রিল্যান্সিং এর অগ্রগতি ১৯৯৮ সালে শুরু হয়েছিল। "GURU" প্রথম ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস যা ১৯৯৮ সালে SOFT moonlighter.com হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর আরো বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস যেমন, Elance.com, RentAcoder.com, Odesk.com, GetAFreelancer.com, Freelancer.com, Lime exchange.com প্রতিষ্ঠিত হয়। Freelancer.com ফ্রিল্যান্সারদের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অনলাইন মার্কেটপ্লেস ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটের কর্মীরা ঘরে বসেই অনলাইনে বিভিন্ন কোম্পানির কাজ করতে পারেন। ম্যাট বেরি Freelancer.com এর প্রতিষ্ঠাতা। এটি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এর অফিস লন্ডন, ম্যানিলা, ভ্যাঙ্কুভার এবং বুয়েনস আইরেসে রয়েছে।

## বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্স কর্মশক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্স কর্মশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিএফডিএস) অনুসারে, গত পাঁচ বছরে (বিএফডিএস, ২০২২) নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা বার্ষিক ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উত্থানের কারণ হিসাবে দায়ী করা যেতে পারে ইন্টারনেটের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি, একটি তরুণ এবং প্রযুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন জনসংখ্যা এবং ফ্রিল্যান্স কাজের দ্বারা অফার করা নমনীয়তার মতো জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্স সেক্টর। বাংলাদেশের প্রধান ফ্রিল্যান্স সেক্টরের মধ্যে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি (IT), গ্রাফিক ডিজাইন, কন্টেন্ট রাইটিং এবং ডিজিটাল মার্কেটিং। এই অঞ্চলগুলি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে চাহিদা বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপ-ওয়ার্ক এবং ফ্রিল্যান্সার (World Bank, 2021) এর মতো গোবাল ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিসহ বাংলাদেশ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং সফ্টওয়্যার প্রোগ্রামিংয়ের একটি হাব হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার ফ্রিল্যান্সার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা) আয় করেন-যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধানে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখছে। অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট (ওআইআই) সম্প্রতি একটি গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফ্রিল্যান্সিং সেবা প্রদানকারী দেশ-যা ১৬% ফ্রিল্যান্সিং সেবা প্রদান করছে, যেখানে ভারত ২০% ফ্রিল্যান্সিং সেবা দিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশি তরুণদের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে গ্লোবাল ফ্রিল্যান্সিং হাব এ পরিণত হবে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সিং।

আমাদের দেশে প্রায় ১৬০০ রকমের ফ্রিল্যান্সিং সেবা দেওয়া হয়। বাংলাদেশি তরুণদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং-এ আরো আধুনিকতর করে গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সম্প্রতি বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)-এর গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং ২৪% প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছাতে পেরেছে। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ২০০৮ সালে ফ্রিল্যান্সিং যুগে প্রবেশ করে। তখন মাত্র ৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্জন করতে সক্ষম হয়- যা এখন বেড়ে ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। অকল্পনীয় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে একমাত্র বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ইন্টারনেট সরবরাহ সুবিধাকরণের মাধ্যমে। যার ফলে, বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফ্রিল্যান্সিং সেবার দেশ। বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা ডিজিটাল সেলস মার্কেটিং সেকশনে বেশি কাজ করে; যেখানে ভারতের ফ্রিল্যান্সাররা টেকনোলজি অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে বেশি পারদর্শী। বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দরকার আরো বেশি প্রশিক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা।

বাংলাদেশে বিপিও সেক্টরের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো প্রডাকশন কোস্ট ইকোনোমি, কারণ আমাদের দেশের জনসংখ্যা, লেবার কোস্ট, আইটি দক্ষতা এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাংলাদেশ পৃথিবীর ফ্রিল্যান্সিং এ নতুন হাব সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে কিছু কোম্পানি যেমন ডিউটিটেকার, জেনেক্স, এএসএল বিপিও, সার্ভিস ইঞ্জিন বিপিও, ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড বিপিও সার্ভিসের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

বহুজাতিক কোম্পানি কোকাকোলা এবং স্যামসাং বাংলাদেশি বিপিও সার্ভিস গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশি মোবাইল অপারেটর্স কল সেন্টারসহ অন্যান্য কোম্পানির কল সেন্টার কনজিউমার গুডস ইন্ডাস্ট্রি এবং হসপিটালগুলো আমাদের লোকাল বিপিও থেকে সেবা গ্রহণ করছে (ডেইলি স্টার-২০১৭)। বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সিং সেবা উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্লাটফর্মে পৌঁছানো সম্ভব- যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সিং এর অবদান ও গুরুত্ব বিগত কয়েক বছরে দেশের অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সারদের অবদান লক্ষণীয়। দেশের বার্ষিক আয়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশ আসে তাদের কাজের মাধ্যমে। বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তি অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর ফ্রিল্যান্সররা ১০ কোটি ডলার আয় করে থাকেন। শ্রমব্যয় কম থাকায় বিশ্বের আউটসোর্সিং বাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে বাংলাদেশ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু-বিভাগীয় গবেষণা ও শিক্ষাদান বিভাগ অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইন্সটিটিউট (ওআইআই) এর এক গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে অনলাইন শ্রমিক সরবরাহে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বাণিজ্য-বিষয়ক পত্রিকা ফোর্বস এর তথ্যমতে ফ্রিল্যান্সিং থেকে আয়ে এগিয়ে থাকা শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। ফ্রিল্যান্সিং আয়ে বাংলাদেশ এর অবস্থান অষ্টম এবং বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ২৭ শতাংশ। বিশ্বে বছরে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার রয়েছে আউটসোর্সিংয়ে। বাংলাদেশে এই খাতে আয় ১ বিলিয়ন হলেও, সম্ভাবনা আছে ৫ বিলিয়ন ডলারের। কিন্তু এই ৫ বিলিয়ন ডলার আয় এর লক্ষ্য পূরণ করতে ফ্রিল্যান্সার এর সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে।

যুবসমাজের বিশাল জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ, এশিয়ার কয়েকটি দেশগুলোর মধ্যে একটি। এর ১৬৩ মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রায় ৬৫%, পঁচিশ বছরের কম বয়সি। এই বিশাল তরুণ ও শক্তিশালী মানবসম্পদ, এখনো প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যদিও ক্যারিয়ার হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং গত কয়েক বছরে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, হাজার হাজার বাংলাদেশের তরুণ এই সুযোগটি কাজে লাগাতে তাদের সহায়তা করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সরকারি সহায়তার প্রয়োজন। আমাদের আইটি সেক্টর এবং আইটি উন্নয়নের উত্থানের কারণে বাংলাদেশে আউটসোর্সিং বেড়েছে। দেশের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকারকে এই খাতে জোরদার হতে হবে যা প্রচুর বিদেশি রেমিট্যান্স উৎপাদন করতে পারে। আউটসোর্সিং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে এবং তা অর্থনীতির সার্থকতা অব্যাহত রাখবে বলে ধারণা করা যায়।

**ফ্রিল্যান্সিংয়ে কোন খাতে কাজের চাহিদা বেশি?**

ফ্রিল্যান্সিং এর প্রত্যেকটি সেক্টরেই এখন চাহিদাযুক্ত সেক্টর হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে বিশেষ করে কয়েকটি সেক্টর রয়েছে যেগুলোর চাহিদা সাধারণ সেক্টর গুলো থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং এর সব থেকে চাহিদাযুক্ত সেক্টরগুলি হলো:

1. Web Development 2. Data Analytics 3. Artificial Intelligence 4. Digital Marketing 5. Video Editing 6. SEO 7. Social Media Marketing 8. Mobile App

Development 9. Block Chain 10. Graphic Design ফ্রিল্যান্সিং এর সুবিধা ফ্রিল্যান্সিং কাজের মধ্যে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং থেকে শুরু করে ওয়েব ডিজাইন, অডিট প্রস্তুতি, এডোবির কাজ এবং সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। এটি উদীয়মান বাজারগুলিতে মানুষের জন্য বিস্তৃত নতুন সুযোগ তৈরি করেছে যা আগে এতো বেশি ছিল না। এশিয়া, বিশ্বজুড়ে আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে নামকরা জায়গা করে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর সেই জায়গায় বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। ফ্রিল্যান্সারদের চাহিদা বর্তমানে অনেক বেশি। তার একটি কারণ এই খাতে কাজের পরিমাণ অনেক বেশি। এ ধরনের কাজের সুবিধাও অনেক। বিশেষ করে গ্রাহক ও কাজের পরিসর অনেক মুক্ত। বিশ্ব বাজারে কাজ করা যায়, কাজের স্থান নিয়েও ভোগান্তি নেই। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ফ্রিল্যান্সারদের ঢাকার মতো জনবহুল শহরের রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যাম ঠেলে অফিস যেতে হয় না। নেই কোন যাতায়ত খরচ বা আলাদা খাবার খরচ। ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে নতুন চাকরি বাজার তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে অনেক সুযোগ। এখন আউটসোর্সিংয়ের বাজার সবচেয়ে বড় এশিয়াতেই। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে এখান থেকে ভালো আয় করার সুযোগ রয়েছে। দ্রুতগতিতে বাংলাদেশে ডিজিটাল রুপ লাভ করায়, শহরে ইন্টারনেট সুবিধা, সরকারি-বেসরকারি প্রচারণায় এই খাত ধীরে ধীরে সবার কাছে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এবং প্রতিদিনই বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা বাড়ছে।

### বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের অসুবিধা

বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা পাইওনিয়ারের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিংয়ের আয় গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিপিও এজেন্সিগুলোকে ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছে এবং বৈধ চ্যানেলে অর্থ আনলে ১০% প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু বর্তমানে কিছু স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠী বৈধ চ্যানেল ব্যবহার না করে অবৈধভাবে ফ্রিল্যান্সিংয়ের আয় গ্রহণ করছে যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হলো আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পে-পোল অ্যাকাউন্ট খোলার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। যার কারণে লাখ লাখ ফ্রিল্যান্সার প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঝামেলার সম্মুখীন হয়। ফ্রিল্যান্সারদের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বহুদিনের আকাঙ্খা যাতে বাংলাদেশে পে-পোল অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈধভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪ কোটি তরুণ ও যুব সমাজ রয়েছে। এই বৃহৎ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করার জন্য সব থেকে যুগোপযোগী উপায় হলো ফ্রিল্যান্সিং। যেখানে সামান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবুও আমাদের দেশে ফ্রিল্যান্সিংয়ে অনেক ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সব থেকে বড় সমস্যা হলো গুণগত প্রশিক্ষণের অভাব এবং কষ্টসাধ্য পেমেন্ট সিস্টেম, ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এছাড়াও রয়েছে কিছু অসাধু চক্র, যারা ফ্রিল্যান্সিং কাজ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অনেকাংশে পিছিয়ে রয়েছে যার জন্য বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কষ্টকর হয়। ফ্রিল্যান্সারদের স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য একটি সমস্যা। পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে ফ্রিল্যান্সিংয়ের স্বীকৃতি খুবই কম। যার জন্য অনেক তরুণ-তরুণী ফ্রিল্যান্সিংয়ে আগ্রহ হারাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি না পেলে ফ্রিল্যান্সিংয়ে আশানুরূপ ফলাফল দুরূহ হয়ে পড়বে।

### ফ্রিল্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানে বর্তমানে সবচেয়ে যুগোপযোগী সমাধান হলো ফ্রিল্যান্সিং। যেটা কোভিড-১৯ এর সময় আমাদের দেশের মানুষ খুব ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। লকডাউনে যখন লাখ লাখ মানুষ চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে, তখন ফ্রিল্যান্সিংই তাদের শেষ ভরসা হিসেবে সহায়তা করেছে। যেটা আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং পেশার অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১০০% ট্যাক্স ফ্রি, বিদেশি কর্মীদের জন্য ৫০% ট্যাক্স ফ্রি প্রথম তিন বছরের জন্য, অফিস ভাড়া এবং ইউটিলিটি বিলের ৮০% ভ্যাট ফ্রি এবং ১০% ক্যাশ ব্যাক এর সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এক্সপোর্ট রেভিনিউর জন্য আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রধান ক্লায়েন্ট হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের তরুণদের ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে; যার ফলে আমাদের দেশে বর্তমানে হাজারো ট্রেনিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। যাতে ফ্রিলান্সিং ট্রেনিংয়ের নামে কিছু স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠী কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে না পারে। বাংলাদেশ সরকার যদি ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং আরো সহজতর করে এবং বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য সহযোগিতা করে তাহলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কারণ এই বৃহৎ জনসংখ্যা অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ

করার মাধ্যমে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক বাড়াতে পারি।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সিংয়ের সম্ভাবনা ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবশ্যই বেকার সমাজকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। কারণ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর। আমাদের তরুণ সমাজকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে বেকার নামক অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব এবং আমরা যদি আমাদের তরুণ সমাজকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারি; তাহলে ভবিষ্যতে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ করা সম্ভব এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান ও অন্যতম সেক্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৪ কোটি ৪০ লাখ তরুণদের প্রতি ১০ জনের একজন বেকার। প্রতিবছরই বিশ্ববিদ্যালয় পেরোনো হাজার হাজার শিক্ষার্থী মনের মতো চাকরি না পেয়ে বেকার হয়ে বসে আছেন। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে খুব সহজেই ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে নানা সুযোগ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওই নিবন্ধে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এতে করে তারা শুধু নিজের জীবিকাই নিশ্চিত করবে না, বরং দেশে অনেক বৈদেশিক মুদ্রাও আনতে সমর্থ হবে যা 'নতুন বাংলাদেশ'র অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। ফ্রিল্যান্সিং এর বাজার যেহেতু প্রতিদিনই বড় হচ্ছে এবং কাজের জন্য কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই তাই বাংলাদেশি যুব সমাজের জন্য ফ্রিল্যান্সিং একটি অনন্য সুযোগ। প্রশিক্ষণ নিয়ে অল্প কদিনের মধ্যেই এই খাতে উপার্জন করা সম্ভব।

## উপসংহার

বাংলাদেশ সরকার ফ্রিল্যান্সিংয়ের দিকে একটু বেশি মনোযোগী হয়েছে পূর্বের তুলনায়। সরকারিভাবে স্কিল ডেভলপমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফ্রি কোর্স চালু করেছে। তবে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আরো নানা ধরনের সুবিধা যুক্ত হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফ্রিল্যান্সিংকে একটি পেশার রূপ দিয়েছে সরকার। যার ফলে অনেক ফ্রিল্যান্সাররা নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু এখনো অনেক ধরনের সমস্যা থেকেই গিয়েছে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য। তবে বলতে গেলে ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থা উন্নয়নের পর্যায়ে ধীরে ধীরে পৌঁছাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশে ইন্টারনেট সুবিধা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাওয়ার ফলে আগের তুলনায় ফ্রিল্যান্সাররা ভালোভাবে কাজ করতে পারতেছে। এর ফলস্বরূপ বাংলাদেশে একটিভ ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখন থেকে যদি সরকার এই বিষয়ে আরো সজাগ থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আরও ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## তথ্যসূত্র


1 Y. Khan et al., "Malicious Insider Attack Detection in IoTs Using Data Analytics" Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2019.2959047, December, 2019,

2 Babauta, Leo. "46 Must-Read Productivity Tips for Freelancers." FreelanceSwitch | Freelance Jobs, Freelance Forum & Directory. N.p., n.d. Web. 8 May 2013.

3 "CIA- The World Factbook." Central Intelligence Agency. N.p., n.d. Web. 6 May 2013. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.

4 Chowdhury, Zakaria. "ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং -এর আদ্যোপান্ত । প্রিয় টেক ." প্রিয় টেক । বাংলায় প্রযুক্তি. N.p., n.d. Web. 6 May 2013. <http://tech.priyo.com/blog/2011/10/29/526.html>.

5 D. Airehrour, J. Gutierrez, and S. K. Ray, ''Secure routing for Internet of Things: A survey,'' J. Netw. Comput. Appl., vol. 66, pp. 198–213, May 2016.

6 Kabir, Al-amin. ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার . Dhaka: DevsTeam Institute, 2012. Print.

7 M. Alvarez et al., ''IBM X-force threat intelligence index: A glimpse at 2017's notable security events,'' IBM Secur., Armonk, NY, USA, Tech. Rep. 77014377-USEN-02, 2018.

8 M. Hung, ‘‘Leading the IoT-gartner insights on how to lead in a connected world,’’ Gartner, Singapore, Tech. Rep., 2017

9 S.-K. Choi, C.-H. Yang, and J. Kwak, ‘‘System hardening and security monitoring for IoT devices to mitigate IoT security vulnerabilities and threats,’’ KSII T---rans. Internet Inf. Syst., vol. 12, no. 2, pp. 906–918, 2018.

10 Torbjornsen, Hilde. "25 Awesome Tips to Become a Successful Freelancer." 1stWebDesigner: A place where you will become a better web designer. N.p., n.d. Web. 8 May 2013.

<www.1stwebdesigner.com/design/25-awesome-tips-succ essful-freelancer/>.

**ড. সঞ্জয় বল:** সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলামনা বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম।

# খেলাধুলা নিয়ে কিছু কথা

মো. আলমগীর হোসেন

ক্রীড়া মানবজাতির প্রাচীনতম অনুশীলন। প্রাচীন যুগে খেলাধুলা ছিল শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মনোরঞ্জনের একমাত্র উপায়। সেই সময়ের প্রচলিত খেলাগুলি ছিল: শিকার, তীরন্দাজি, লাঠিখেলা ইত্যাদি। এগুলি আধুনিক খেলাধূলার বীজ বপন করেছিল। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে খেলাধুলাও বিকশিত হয়েছে। খেলাধুলা আজ আর শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতা বা মনোরঞ্জনের জন্য নয়, এটি একটি বৃহত্তর শিল্প ও ব্যবসায়িক খাতে পরিণত হয়েছে। আধুনিক যুগে ক্রীড়ার নিয়ম-কানুন, নৈতিকতা ও প্রতিযোগিতামূলক মান আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন যুগে খেলা ছিল একান্তই স্থানীয় পর্যায়ের। কিন্তু বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা এখন মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে, প্রাচীন যুগে খেলা শুধু বিনোদনের মাধ্যমই ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক খাত হিসাবে বিবেচিত হয়। খেলার আয়োজন, খেলোয়াড় নিয়োগ, সরঞ্জামাদি উৎপাদন এবং বিপণন ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এখন অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করছেন।

এছাড়াও, আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে খেলাধুলার রূপরেখা পাল্টে গেছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও দর্শকদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই যেমন বাংলাদেশের ক্রীড়ার প্রাচীন কালের ঐতিহ্য সম্পর্কে বলতে হয় বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের এক পূর্ব ঐতিহ্য রয়েছে। এদেশের মাটিতে অনেক প্রাচীন খেলাধুলার বীজ রোপিত হয়েছে যা আজকের আধুনিক খেলাগুলির পথ প্রশস্ত করেছে।

হাজার হাজার বছর আগে বর্তমান বাংলাদেশের অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষরা নানা ধরনের খেলা করত। কৃষক সমাজের মানুষরা শ্রমবিরতির সময় মাঠে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে খেলাধুলা করত। এর মধ্যে বল খেলা, লাঠিখেলা, তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাজপরিবারের সদস্যরা ও সামন্ত ভূস্বামীদের খেলাধুলা কিছুটা আলাদা ধরনের ছিল। তাঁদের প্রচলিত খেলাগুলির মধ্যে ছিল ঘোড়া হাঁটানো, তরবারি খেলা, শিকার প্রভৃতি। এসব খেলাধুলা শারীরিক দক্ষতা এবং যুদ্ধকৌশল অর্জনের লক্ষ্যে করা হত।

চর্যাপদেও বিভিন্ন খেলাধুলার বর্ণনা পাওয়া যায়। লাঠিখেলা, তীরন্দাজি, শিকার প্রভৃতি তাদের প্রিয় খেলাগুলির মধ্যে ছিল। কোনো কোনো কবিতায় বলা হয়েছে, সাধুরা মাঝে মাঝে বল খেলা খেলতেন।

প্রাচীন বাংলার লোকজীবনের সাথে জড়িত হয়ে আরও অনেক খেলাধুলার উদ্ভব হয়েছিল। হা-ডু-ডু খেলা, ডাঙগুলি খেলা, মরিচ খেলা, কাঁচ খেলা প্রভৃতি তার কিছু উদাহরণ।

এছাড়াও বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যেও নিজস্ব প্রাচীন খেলাধুলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ পাহাড়ি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাস খেলা, তীরন্দাজি খেলা, বীর আকৃতি অঙ্কন প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রীড়ার একটি ঐতিহ্য বিরাজমান। এসব প্রাচীন খেলাধুলাগুলি আজকের আধুনিক খেলাগুলির পথিকৃৎ হয়েছে এবং আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে ক্রীড়াঙ্গনের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নয়। যদিও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তবুও অনেক সমস্যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথমত, দেশে প্রয়োজনীয় আধুনিক ক্রীড়া সুবিধা এবং অবকাঠামোর ব্যাপক অভাব রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল এবং দুর্গম এলাকায় ক্রীড়ার জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ, স্টেডিয়াম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। দক্ষ প্রশিক্ষক ও নির্দেশকদের অভাব এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অপরিপূর্ণতা লক্ষণীয়।

তৃতীয়ত, অর্থ সংকটও ক্রীড়া খাতের একটি বড় সমস্যা। ক্রীড়াবিদদের যথাযথ আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় অনেকে মধ্যপথেই প্রতিভা হারিয়ে ফেলছেন। এছাড়াও ক্লাবগুলোর আর্থিক দুরবস্থার কারণে ক্রীড়ার প্রসার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

চতুর্থত, সমাজে এখনও ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা কম। অনেক অভিভাবক ক্রীড়ার বিকল্প হিসেবে চাকরি বা ব্যবসা নির্বাচন করেন। ফলে প্রতিভাবান অনেক ক্রীড়াবিদ ক্রীড়া থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন।

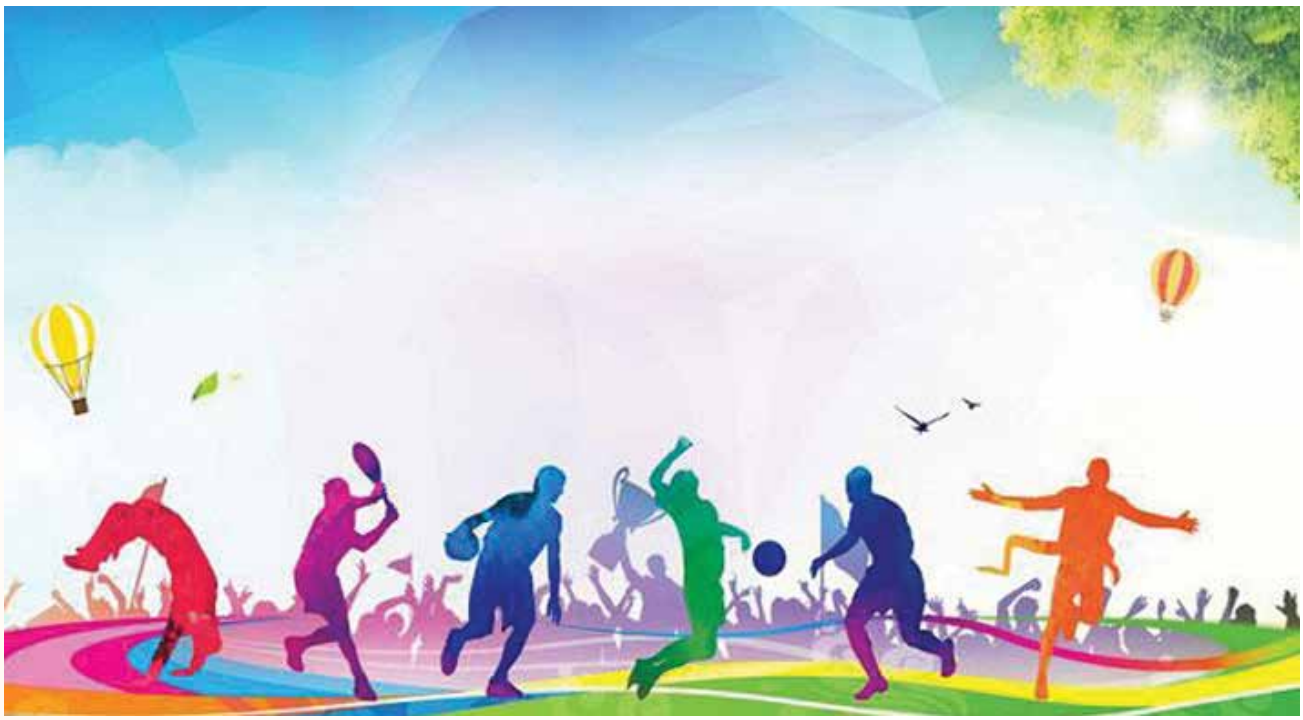

পঞ্চমত, নারী ক্রীড়াবিদদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীদের নিরাপত্তা বিষয়টি বাংলাদেশে এখনও এক বড় চ্যালেঞ্জ। কনজার্ভেটিভ মনোভাব ও অপরিচিত পরিবেশের কারণে নারীরা প্রায়শই ক্রীড়া থেকে দূরে সরে যান।

সবশেষে, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্নীতি ক্রীড়া খাতের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। ভ্রষ্ট ব্যবস্থাপনার কারণে অনেক ক্রীড়া সংস্থাই যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।

সুতরাং স্পষ্টতই বাংলাদেশের ক্রীড়া খাতে অনেক সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি দূরীকরণের জন্য সুষম পরিকল্পনা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র সরকারি নয়, বেসরকারি উদ্যোগ এবং সমাজের সহযোগিতাও এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

বাংলাদেশ সরকার ক্রীড়া খাতের উন্নয়ন এবং ক্রীড়ার মান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। নিম্নে সেগুলির কিছু আলোচনা করা হলো:

১. **ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ:** সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক ক্রীড়া কমপেক্স, স্টেডিয়াম এবং মাঠ নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শের-ই-বাংলা ক্রীড়া কমপেক্স প্রভৃতি।

২. **এখেলো বাংলাদেশ প্রকল্প:** ২০১০ সালে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম ও ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩. **বৃত্তি প্রদান:** সরকার প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের মাসিক বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এতে করে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করতে পারেন।

৪. **প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:** বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করেছে যেখানে ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৫. **বিদেশি প্রশিক্ষকদের নিয়োগ:** আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে সরকার বিভিন্ন খেলাধুলায় বিদেশি প্রশিক্ষকদের নিযুক্ত করেছে।

৬. **বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** এটি ক্রীড়া শিক্ষার জন্য একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে ক্রীড়াবিদ এবং প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

৭. **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সক্রিয়করণ:** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে আরও কার্যকর করে তোলা হয়েছে যাতে সেটি ক্রীড়ার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. **ক্রীড়া আইন প্রণয়ন:** সরকার ক্রীড়া খাতকে সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শৃঙ্খলা আইন প্রণয়ন করেছে।

৯. **আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন:** বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে যা দেশের ক্রীড়াবিদদের জন্য বড় অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।

এছাড়াও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়ার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে সবার উপর বলা যায়, সরকার ক্রীড়ার সুষম বিকাশের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে।

ক্রীড়ার মাধ্যমে সুস্থ সুন্দর স্মার্ট জাতি বিনির্মাণে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত।

মো. আলমগীর হোসেন: শরীরচর্চা শিক্ষক
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কাবিল স্যার: তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

মো. নাহিদ আনদালিব

আমরা খুব সহজেই হতাশ হয়ে পড়ি, নিজের উপর আস্থা রাখতে পারি না। মাঝেমধ্যে চিন্তা হয়, আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। আমি সচ্ছল নই, আমি কীভাবে পড়াশোনা করবো, কীভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করব। আজ আমি এমন এক প্রতিভাবান ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব যিনি সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে সফলতার প্রায়-শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরবিন্দু আহরণের পূর্বেই আল্লহ রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমার গল্পটা আজ তাকে নিয়ে।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামে ১৯৭৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর জন্ম হয় এই মহান মানুষটির। তার পিতার নাম রাসেল মন্ডল, মাতার নাম শামিমা খাতুন। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। দারিদ্রপীড়িত এই পরিবারের কাছে লেখাপড়া করা ছিল কেবলই বিলাসিতা! যেহেতু তিনি ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, তাই শৈশব থেকেই নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে তাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। নিবিড় ও নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায় তাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যায়। শৈশব থেকেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা চিন্তা করে নানাভাবে তিনি পরিবারকে সাহায্য করতেন, কখনো কৃষিকাজে, কখনো-বা দর্জির কাজে সুঁই সুতা দিয়ে জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়ে ভাইদের সহযোগিতা করতেন। এমন অনেক কাজ করেছেন যা তার পরিবারকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। নিজ গ্রাম কাষ্টদহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৮৯ সালে গাংনী পাইলট হাইস্কুলে ভর্তি হন। তখনকার দিনে রাস্তাঘাট ভাল ছিল না, কর্দমাক্ত রাস্তা মাড়িয়ে তিনি প্রতিদিন স্কুলে যেতেন। পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারি বৃত্তিতে তিনি লেখাপড়া করেছেন। ১৯৯৪ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৬ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। মেহেরপুর সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক এ এফ এম জাহিদুর রহমান তাকে বইপত্র দিয়ে ও বিনামূল্যে প্রাইভেট পড়িয়ে সহযোগিতা করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকত্তোর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন তিনি। ২৬শ বিসিএসের মাধ্যমে শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন। ২১ শে মার্চ, ২০০৬ মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে প্রভাষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৫ মে, ২০১৩ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে যোগদান করেন। কিছু দিন পর আবারও মেহেরপুর সরকারি কলেজে ফিরে আসেন। ২০২০--২০২৩ পর্যন্ত টানা দুই মেয়াদে তিনি মেহেরপুর কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষায় ও কলেজের উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০২৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএস-এ পিএইচডি ফেলো হিসেব গবেষণা কাজে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পারেননি। ৮-এপ্রিল ২০২৪, সকাল ১০: ২৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে সকলকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে এক অমিত

সম্ভবনাময় মানুষের পথচলা। তিনি গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের আক্তার বানুর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই সন্তানের জনক ছিলেন তিনি, তার বড় মেয়ে জান্নাতুল মাওয়া কাভি নবম শ্রেণিতে ও ৯ ছেলে কাব্য চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

এতক্ষণ যার সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের প্রিয় কাবিলউদ্দিন স্যার। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী। কেবল মেধাবী ছাত্র ছিলেন না, মানুষ হিসেবে ছিলেন কঠোর সংগ্রামী, পারতেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে। আজকের লেখাটি লিখছি, আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে, যারা আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবেন, যারা আমাদের দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, লেখাটি শুধু তাদের উদ্দেশে। অভিনেতা মামুনর রশীদকে বলতে শুনেছিলাম আমাদের দেশে রুচির দুর্ভিক্ষ চলছে। কথাটি হয়তো সত্য, না হলে আমাদের দেশের কিশোর-তরুণরা আজ কেন ফেসবুক-টিকটকে মেতে থাকবে। নিজেকে ভাইরাল করার জন্য যেকোন বিষয় মানুষের সামনে উপস্থাপন করে নিজেকে হাসির পাত্র করে তুলবে?

আমরা যদি কাবিল স্যারের জীবনকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখবো জীবনযুদ্ধের হার না-মানা একজন সৈনিককে। যিনি কোনোদিন হারতে জানেননি, চরম দারিদ্র্য তাকে পেছন দিকে টেনে ধরতে পারেনি। যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, তখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদের প্রাইভেট পড়িয়েছেন, যখন নবম শ্রেণিতে পড়তেন তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াতেন। এভাবেই ছাত্রজীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছাত্র পড়িয়েই নিজের পড়াশোনা, চলাফেরা ও নিজের আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করতেন।

একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ছিলেন তিনি। শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনে অবসর সময়ে তিনি ছাত্রদের প্রাইভেট পড়িয়েছেন আর এভাবেই তিনি তার জীবনের সচ্ছলতার মুখ দেখেন। ইংরেজি বিষয়ের জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন তিনি, কোন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে কোন বিষয় বুঝতে না পারলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে তিনি তাদের আলাদা করে বোঝাতেন। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পারলে স্যার খুব খুশি হতেন। এখন প্রশ্ন, জীবন চলার পথে আমরা কাকে অনুসরণ করবো? সোশ্যাল মিডিয়ার হিরো আলমদের, না কাবিল স্যারের মত মানুষদের যারা ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়াতে জানেন, যাদের সংগ্রামী জীবনকাহিনী সিনেমাকেও হার মানায়। কাবিল স্যারের মত মানুষেরা আমাদের আইকনিক ফিগার, যারা শুধুমাত্র নিজের টাকায় লেখাপড়া শেখে, পরিবারকে চাপ দিতে জানে না, অযাচিত দাবি-দাওয়া পেশ করে বাবাকে কষ্ট দেয় না। সরকারি চাকুরিতে যোগদানের পর নতুন করে চাকরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তার হাতে আরোও চার বছর সময় ছিল, কিন্তু স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় দুর্নীতমুক্ত সৎ পেশা হিসাবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নেন। হয়তো অন্য পেশা বেছে নিলে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতেন, কিন্তু যার ধ্যানজ্ঞান ছিল শিক্ষাকে ঘিরে, তিনি কখনও শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে পারেন? পারেন না। সেটায় তিনি প্রমাণ দিয়ে গেলেন। সারা রাত পড়তেন, পড়া ছিল তার নেশা, যেদিন মারা গেলেন তার আগের রাতেও না-ঘুমিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সেহেরি খেয়ে ঘুমাতে গিয়েছিলেন, হয়তো একটু বেশিই পরিশ্রম করে ফেলেছিলেন তাই শরীরটা আর আগের মতো সাড়া দেয়নি।

আমার এই গল্প একজন ঘুরে দাঁড়ানো মানুষকে নিয়ে। বাংলাদেশে নির্মাতারা নাটক বা সিনেমা বানাতে ভালো কাহিনি খুঁজে পান না। হিন্দি, তামিল বা অন্য দেশের সিনেমা থেকে কাহিনি ধার করে সিনেমা বানানো হয় যার সঙ্গে আমাদের জীবন-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে হাজারো কাবিল উদ্দিন আছেন, যাদের জীবনকাহিনি যদি নাটক বা সিনেমায় তুলে ধরা যায় তাহলে দেশের তরুণ ও যুব সমাজ উপলব্ধি করতে পারবে শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চরম প্রতিকূলতাকে জয় করা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া খুব ধনীর সন্তানরা লেখাপড়ায় ভাল হয় না। বরং শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে সফলতা পেয়েছেন হতদরিদ্র, দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগতরা।

ইতিহাসের ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে আমি অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় অনেক সফল বা বিফল মানুষের উদাহরণ টানি। আমার দেওয়া গল্প শুনে অনেক শিক্ষর্থীকে বলতে শুনেছি, 'স্যার, কথাটি আজ বলছেন, কথাটি যদি কিছুদিন আগে বলতেন, তাহলে হয়তো আমাদের জীবনটাই বদলে যেত, আমরা হয়তো ঘুরে দাঁড়তে পারতাম'। আমরা লক্ষ করি, মানুষ মানুষকে নিরুৎসাহিত করে বলে তোমার দ্বারা কিছু হবে না, কিন্তু কেউ বলে না তুমিই পারবে এটি তোমার দ্বারাই সম্ভব। যাই হোক লেখাটি পড়ে কারো জীবনে যদি সামান্য উপকারও হয়, তবেই লেখাটি সার্থক হবে।

মো. নাহিদ আনদালিব: প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ

**বই পড়ার অভ্যাস নেই আর পড়তে জানে না এমন লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।**

মার্ক টোয়েন

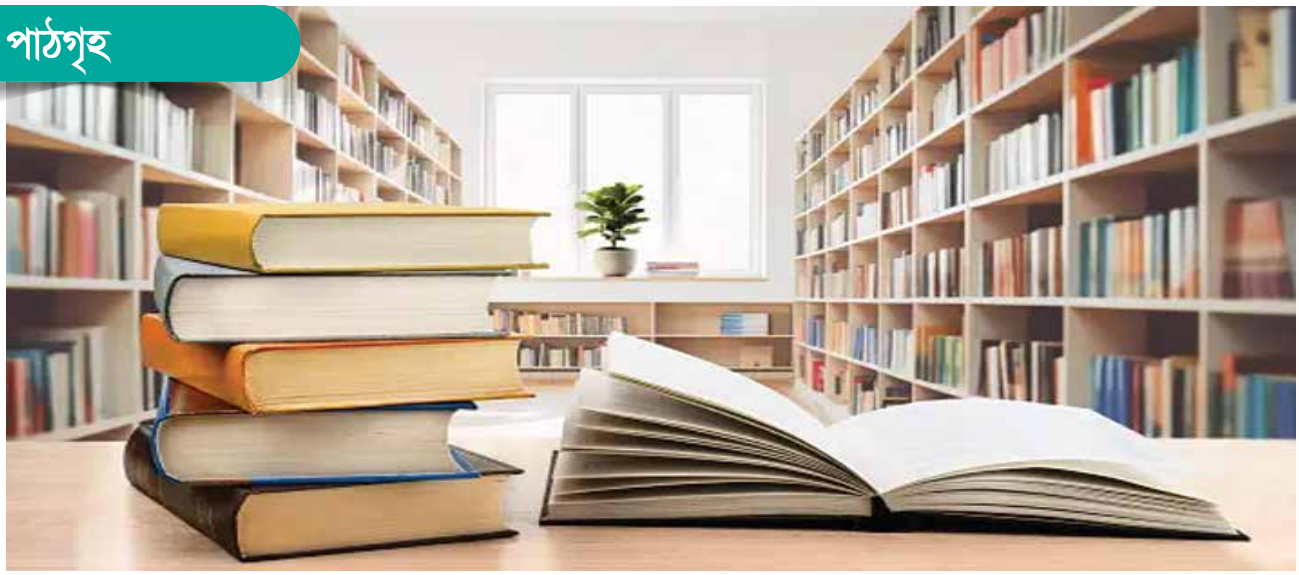

# কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহারের উপকারিতা

মো. শহীদুল ইসলাম

লাইব্রেরি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড। উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় কলেজ শিক্ষার মাধ্যমে। আর কলেজ শিক্ষার সফলতার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে কলেজ লাইব্রেরি। তাই কলেজ লাইব্রেরিকে সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রাণ বলা হয়ে থাকে। কলেজের ছাত্র-শিক্ষকের চাহিদা পূরণ করাই এধরনের লাইব্রেরির প্রধান উদ্দেশ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাইব্রেরিকে মহাসমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন এবং প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে হাসপাতালের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কলেজ লাইব্রেরিতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নোক্ত উপকার পেয়ে থাকে:

১. একটি বিষয়ের উপর একাধিক লেখকের বই ব্যবহারের মাধ্যমে সে তার যে কোনো টপিক বা অধ্যায়কে develop করতে পারে।

২. নিয়মিত লাইব্রেরি ওয়ার্ক করলে সে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে এবং লেখার মান বৃদ্ধি করতে পারে।

৩. লাইব্রেরিতে বিদ্যমান সফল ব্যক্তিদের জীবনীমূলক বই পড়লে একজন ছাত্র অনুপ্রাণিত হতে পারে। ফলে সে তার জীবনকে পুরোটাই বদলে দিতে পারে।

৪. লাইব্রেরিতে নিয়মিত বইপড়ার অভ্যাস করলে ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সে তার বাস্তব জীবনের যে কোনো সমস্যা অনায়াসে সমাধান করতে পারে।

৫. লাইব্রেরিতে বই পড়ার মনোরম পরিবেশ থাকে। ফলে একজন ছাত্র যখন একটা বই পড়ে তখন সে ঐ বইটির মধ্যেই ডুবে থেকে মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে।

৬. বিখ্যাত লেখকদের বইপড়া মানে তাদের সাথে কথা বলা। অর্থাৎ একজন ছাত্র বা ছাত্রী যখন যে লেখকের বই পড়বে তখন সে সেই লেখকের সাথে সাক্ষাৎ করার মতো সার্থকতা পায়।

৭. একজন ছাত্র ভবিষ্যতে কী হবে তার বই পড়ার অভ্যাস দেখলে বোঝা যায়। তাই নিয়মিত লাইব্রেরিমুখী হওয়ার বিকল্প নেই।

৮. যেহেতু কলেজ লাইব্রেরিতে বই ছাড়াও দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ থাকে, সেগুলো নিয়মিত পড়ার মাধ্যমে একজন ছাত্র বিশ্বে চলমান ঘটনার সাথে নিজেকে আপডেট রাখতে পারে।

৯. একজন ছাত্র লাইব্রেরিতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই পড়লে তার মস্তিকের ব্যায়াম হয়। ফলে মস্তিস্কের স্মৃতিধারণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০. একজন ছাত্রের নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে উঠলে শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান এবং লাইব্রেরি স্টাফদের সাথে তার সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। ফলে সম্পর্ক দৃঢ় ও উন্নত হয়।

১১. অবসর বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বই। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর বিনোদনের জন্য ক্ষতিকর কোন পথে না গিয়ে লাইব্রেরিতে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাদের অবসর সময় কাটাতে পারে।

কলেজ লাইব্রেরিকে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করা হয়। যে কলেজের লাইব্রেরি যত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী, সে কলেজে শিক্ষার মানও তত উন্নত ও সমৃদ্ধ। কার্ল রোয়ান বলেছেন, "লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের মন্দির, বিশ্বের সমস্ত যুদ্ধ যত মানুষকে মুক্ত করেছে তার চাইতে অনেক বেশি মানুষ মুক্ত হয়েছে জ্ঞানের কারণে।"

মো. শহীদুল ইসলাম: লাইব্রেরিয়ান, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

## মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

**প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর**
অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

**মো. এজাজ হোসেন খান**
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা

**মো. খেজমত আলি মালিথ্যা**
সহযোগী অধ্যাপক (ইনসিটু)
বাংলা

**মঈনুল ইসলাম**
সহকারী অধ্যাপক
ৎবাংলা

**সানজিদা ফেরদৌস**
প্রভাষক
বাংলা

**মো: মনিরুজ্জামান**
প্রভাষক বাংলা

**নিলুফার ইয়াসমিন**
প্রভাষক
বাংলা

**মো. খুরশীদ আলম**
অধ্যাপক (ইনসিটু)
ইংরেজি

**মোহা. হাসানুজ্জামান**
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি

**মাহামুদা পারভীন**
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি

**মিলন মন্ডল**
প্রভাষক
ইংরেজি

**মনিরুজ্জামান**
প্রভাষক
ইংরেজি

**মীর মো: মাহফুজ আলী**
প্রভাষক
ইংরেজি

## মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

**মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন**
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

**মো. ফুয়াদ খাঁন**
সহযোগী অধ্যাপক, (ইনসিটু)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

**বশির আহাম্মেদ**
সহকারী অধ্যাপক (ইনসিটু)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

**শামীমা নাসরিন**
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

**মো: হাবিবুর রহমান**
সহযোগী অধ্যাপক
অর্থনীতি

**ড. সঞ্জয় বল**
সহকারী অধ্যাপক
অর্থনীতি

**মো: জাফর ইকবাল**
প্রভাষক
অর্থনীতি

**মো. এনামুল হক**
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন

**মো: মনিরুল ইসলাম**
প্রভাষক
দর্শন

**মো: জামসেদুর রহমান**
প্রভাষক
দর্শন

**মো. তারিকুল ইসলাম**
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

**মো: কাউছার আলী**
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

**মো: নাহিদ আনদালিব**
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

**মো: তৌফিকুল ইসলাম**
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

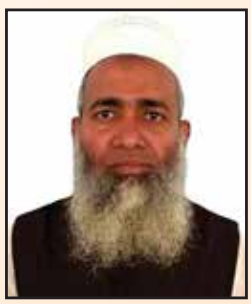

**মো: মামুন খান**
সহকারী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান

**দুর্জয় বৈরাগী**
সহকারী অধ্যাপক (ইসসিটু)
হিসাববিজ্ঞান

## মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

**মো: রফিকুল ইসলাম**
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

**মোহা: এনামুল হক**
সহকারী অধ্যাপক(সংযুক্ত)
ব্যবস্থাপনা

**মুন্সী এ.এইচ.এম. রাশেদুল হক**
সহকারী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা

**মো: জাহিদুর রহমান**
সহকারী অধ্যাপক (সংযুক্ত)
পদার্থবিজ্ঞান

**ওমর ফারুক**
প্রভাষক
পদার্থবিজ্ঞান

**মোহা. আব্দুল রতিফ**
সহযোগী অধ্যাপক (ইনসিটু)
রসায়ন

**সৈয়দ মনিরুজ্জামান**
সহযোগী অধ্যাপক (সংযুক্ত)
রসায়ন

**মো. নাহিদ রেজা**
প্রভাষক
রসায়ন

**নজির আহমদ সিদ্দিক**
সহকারী অধ্যাপক
গণিত

**রিয়া রাণী শীল**
প্রভাষক
গণিত

**তানজিনা আফরিন**
সহকারী অধ্যাপক
উদ্ভিদবিদ্যা

**গোলাম মহিউদ্দীন**
প্রভাষক
উদ্ভিদবিদ্যা

**মোছা: আউলিয়া খাতুন**
প্রভাষক
প্রাণিবিদ্যা

**মো: শহিদুল ইসলাম**
গ্রন্থাগারিক

**মো. আলমগীর হোসেন**
শরীর চর্চা শিক্ষক

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

## সরকারি কর্মচারী

**মোছা. সালমা আক্তার**
প্রধান সহকারী

**মো. আজিমুল ইসলাম**
অফিস সহকারী

**মো. মুকুল হোসেন**
হিসাব সহকারী

**তরিকুল ইসলাম**
ক্যাশিয়ার

**মোছা. আফরোজা খানম**
দক্ষ বেয়ারার

**মো. ইছাহক আলী**
অফিস সহায়ক

**মো. ছমির উদ্দীন**
অফিস সহায়ক

**মো: ছানোয়ার খাঁন**
অফিস সহায়ক

**মো. আলাউদ্দিন**
অফিস সহায়ক

**মোছা. আছিয়া খাতুন**
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

## বেসরকারি কর্মচারী

**মো. আশরাফুল ইসলাম**
ক্যাশ সরকার

**মো. কলিমউদ্দীন**
অফিস সহায়ক, রসায়ন

**মো. মিনহাজ উদ্দীন**
সেমিনার সহকারী, বাংলা

**মেহেরুবা ডলি**
সেমিনার সহাকরী, ইংরেজি

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

## বেসরকারি কর্মচারী

**মো. শফিকুল ইসলাম**
অফিস সহায়ক, অধ্যক্ষ চেম্বার

**মো. আবুল কালাম আজাদ**
সেমিনার সহকারী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

**মো. হাসেল খাঁন**
সেমিনার সহকারী, অর্থনীতি

**মো. মেহেদী হাসান**
কম্পিউটার অপরেটর

**মো. রাজু আহমেদ**
অফিস সহায়ক

**মো. জুয়েল রানা**
নৈশ প্রহারী

**মো. দবির হোসেন**
নৈশ প্রহরী

**মো. নজরুল ইসলাম**
সেমিনার সহকারী, দর্শন

**মো. সিরাজুল ইসলাম**
সেমিনার সহকারী, ইস: ইতি: ও সংস্কৃতি

**কিবরিয়া হোসেন**
সেমিনার সহকারী, হিসাববিজ্ঞান

**এনামুল হক বাবলু**
দিবা প্রহরী

**মো. হাফিজুর রহমান**
সেমিনার সহকারী, ব্যবস্থাপনা

**মো. হাবিবুর রহমান**
অফিস সহায়ক, লাইব্রেরি

**জাহিদুল ইসলাম**
কম্পিউটার অপারেটর

**মুকুল হোসেন**
মালী

**মো. শান্ত খান**
দিবা প্রহরী

## মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

## বেসরকারি কর্মচারী

**মো. রাজু আহমেদ**
নৈশ প্রহরী

**সোনিয়া খাতুন**
দিবা প্রহরী, মহিলা হোস্টেল

**মোঃ শক্তি**
দিবা প্রহরী

**মো. পলোক আহমদ**
অফিস সহায়ক

**মাওলানা আহমাদুল্লাহ**
পেশ ইমাম
কলেজ মসজিদ

**মোঃ ফিরোজ আলী**
মুয়াজ্জিন
কলেজ মসজিদ

**শ্রীমতি ননী বালা**
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

**শ্রীমতি সাবিত্রী বালা**
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

# ম্যাগাজিন প্রকাশনা কমিটি-২০২৪

**প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর**
অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

**মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন**
আহবায়ক

**মো. খেজমত আলি মালিথ্যা**
সদস্য

**মনিরুজ্জামান**
সদস্য

**ওমর ফারুক**
সদস্য

# মেহেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ (২০২৩-২০২৪)

**প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর**
সভাপতি
শিক্ষক পরিষদ ও অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

**মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন**
সম্পাদক
শিক্ষক পরিষদ, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

**মিলন মন্ডল**
সহ-সম্পাদক
শিক্ষক পরিষদ, প্রভাষক, ইংরেজি
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

**মো. নাহিদ রেজা**
কোষাধ্যক্ষ
শিক্ষক পরিষদ, প্রভাষক, রসায়ন
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

শুভ নববর্ষ ১৪৩১
উদ্‌যাপন উপলক্ষে
মঙ্গল শোভাযাত্রা
০১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ।। ১৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ০৮:০০ টা
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চুক্তি (২০২৪-২৫) স্বাক্ষর ও পুরস্কার প্রদান
শখ হারুনর রশীদ
শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

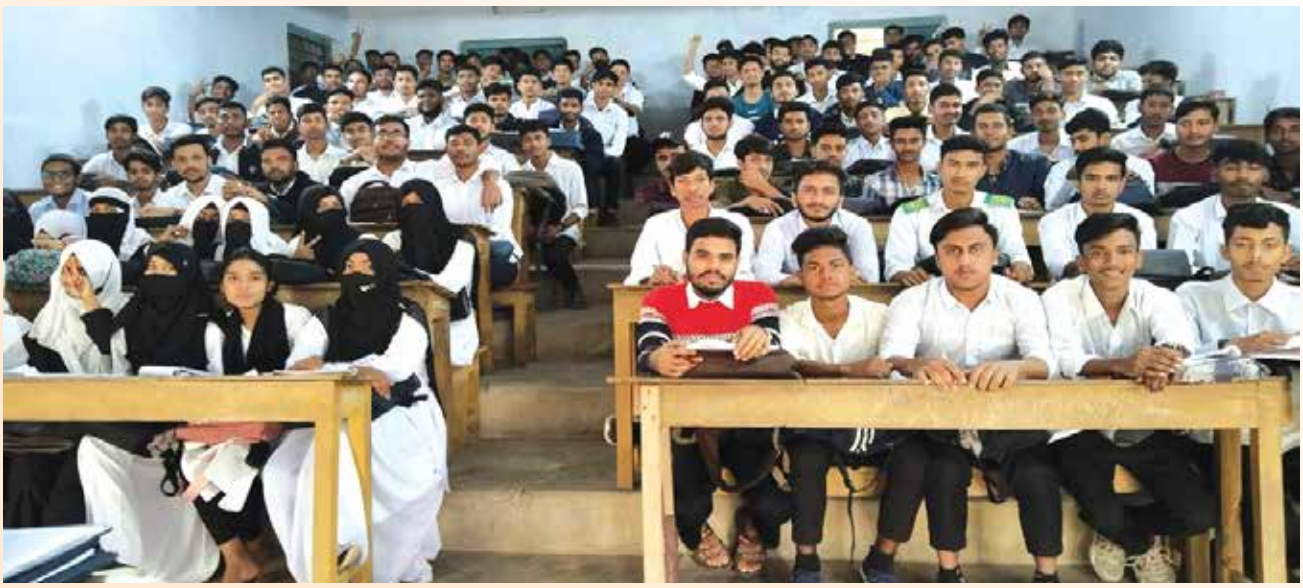

মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

সুবিধাবঞ্চিত,
পরিবারের
কর্মসূচি
সোসাইটি

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে
সুবিধাবঞ্চিত, অসহায় পরিবারের
কর্মসূচি
সোসাইটি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর